Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বর্ণবাদ ও ইসলাম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাহিনা ফারহিন

রোলঃ 216020984

১ জুন, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বর্ণবাদ ও ইসলাম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাহিনা ফারহিন

রোলঃ 216020984

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "বর্ণবাদ ও ইসলাম" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শাহিনা ফারহিন, আইডিঃ 216020984 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "বর্ণবাদ ও ইসলাম" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১ জুন, ২০২৪ ইং

শাহিনা ফারহিন

আইডিঃ 216020984

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বর্ণবাদ কি?

বর্ণবাদ হলো এমন একটি সামাজিক বা বৈষম্যমূলক আচরণ, যা মানুষকে তাদের বর্ণ বা জাতির ভিত্তিতে অসমভাবে বিচার করে। এটি এক ধরনের বৈষম্য যা নির্দিষ্ট বর্ণ বা জাতির মানুষের প্রতি বিদ্বেষ বা নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করে। বর্ণবাদের কারণে সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হতে পারে, যা সামাজিক ঐক্য এবং সাম্যতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

এটি এমন একটি বিশ্বাস বা মনোভাব যা মানুষকে তাদের জাতি বা বর্ণের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব বা নিকৃষ্টতা নির্ধারণ করে এবং বিভিন্ন বর্ণের মানুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে। এটি সাধারণত একটি জাতি বা বর্ণকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং এর ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি হয়। বর্ণবাদী মনোভাবের ফলে বিভিন্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ, অবিচার এবং বৈষম্যের জন্ম হয়, যা সমাজে অস্থিরতা ও অন্যায়ের কারণ হতে পারে।

বর্ণবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা, যার প্রভাব বহুমুখী ও ব্যাপক। এর ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে, যেমন -সামাজিক ন্যায়বিচারে অসংগতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন, সামাজিক একতা ও শান্তি বিনষ্ট হওয়া, অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি, শিক্ষার সুযোগ ও স্বাস্থ্যসেবায় বৈষম্য সৃষ্টি, মানসিক স্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার ইত্যাদি।

বর্ণবাদের প্রভাব থেকে মুক্তির জন্য সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার এবং আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র তখনই একটি সমতা, ন্যায়বিচার এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করা সম্ভব।

বর্ণবাদের ইতিহাস

বর্ণবাদের ইতিহাস মানব সভ্যতার অনেক পুরনো ও জটিল একটি অংশ। বর্ণবাদ সৃষ্টি ও এর বিকাশ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্নভাবে ঘটেছে। নিচে বর্ণবাদের ইতিহাসের কিছু মূল দিক তুলে ধরা হলো:

প্রাচীন কাল

১. প্রাচীন সভ্যতায় বর্ণবাদ :

- প্রাচীন গ্রিস ও রোমে কিছু সীমিত বর্ণবৈষম্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যদিও এই সমাজগুলোতে দাসত্ব বিদ্যমান ছিল, তা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতিগত ভিত্তিতে নয়, বরং বিজিতদের দাস বানানোর উপর নির্ভরশীল।

মধ্যযুগ

২. মধ্যযুগে ধর্মীয় বর্ণবাদ :

- মধ্যযুগে বিশেষ করে ইউরোপে ধর্মীয় ভিত্তিতে বর্ণবাদ দেখা গেছে। ক্রুসেডের সময় মুসলমান ও ইহুদিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হত। এটি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট একটি বর্ণবাদের রূপ।

ঔপনিবেশিক যুগ

৩. ঔপনিবেশিক যুগে বর্ণবাদ :

- **১৫**শ থেকে **১৯**শ শতকের মধ্যে ইউরোপীয় দেশগুলি আফ্রিকা, এশিয়া ও আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে। এই সময় দাস ব্যবসা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়। ইউরোপীয়রা নিজেদের শ্রেষ্ঠ জাতি বলে মনে করত এবং আফ্রিকান ও অন্যান্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অবমূল্যায়ন করত।

১৮শ ও ১৯শ শতক

৪. বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদ :

- **১৮**শ ও **১৯**শ শতকে বিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যায় বর্ণবাদের সুর প্রকট হয়ে ওঠে। কিছু বিজ্ঞানী ও দার্শনিক বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা প্রচার করেন। উদাহরণস্বরূপ, "ইউজেনিক্স" নামে একটি মতবাদ প্রচলিত হয়, যা মানুষের জিনগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করত।

আধুনিক যুগ

৫. ১৯শ ও ২০শ শতকের রাজনৈতিক বর্ণবাদ :

- **১৯**শ ও ২০শ শতকের প্রথম দিকে দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যাপারথেইড, যুক্তরাষ্ট্রের জিম ক্রো আইন, এবং ইউরোপে ইহুদিবিরোধী প্রচারণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৩০ ও ১৯৪০ এর দশকে নাৎসি জার্মানির ইহুদি নির্যাতন তথা হলোকাস্ট বর্ণবাদের একটি নির্মম উদাহরণ।

বর্তমান যুগ

৬.বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন:

- ২০শ ও ২১শ শতকে বিশ্বব্যাপী বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার আন্দোলন, দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যাপারথেইড বিরোধী আন্দোলন এবং সাম্প্রতিক ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলন উল্লেখযোগ্য।

বর্ণবাদের ইতিহাস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে দেখা গেছে এবং এটি এখনও বিভিন্ন সমাজে বিদ্যমান। তবে, বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধি, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন, এবং বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বর্ণবাদের মূল ইতিহাস জানা ও বোঝা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বর্ণবাদ : অন্যান্য ধর্ম বনাম ইসলাম

হিন্দুধর্মে বর্ণবাদ :

হিন্দুধর্মে বর্ণ ব্যবস্থা (varna system) একটি প্রাচীন সমাজব্যবস্থা যা চারটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শূদ্র। এই ব্যবস্থার মূল ধারণা ছিল কর্মভিত্তিক বিভাজন, যেখানে প্রতিটি বর্ণের নির্দিষ্ট ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব ছিল।

ব্রাহ্মণ
ক্ষত্রিয়
বৈশ্য
শূদ্র

হিন্দু বর্ণ ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

১. ব্রাহ্মণ :পুরোহিত ও জ্ঞানী শ্রেণী। তাদের কাজ ছিল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করা, শিক্ষা দান করা এবং ধর্মীয় গ্রন্থ সংরক্ষণ করা।

২. ক্ষত্রিয় : যোদ্ধা ও রক্ষক শ্রেণী। তাদের দায়িত্ব ছিল সমাজ ও রাজ্য রক্ষা করা এবং শাসন পরিচালনা করা।

৩. বৈশ্য : কৃষক, বণিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত শ্রেণী। তারা সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করত।

৪. শূদ্র : শ্রমিক ও সেবা প্রদানকারী শ্রেণী। তাদের প্রধান কাজ ছিল অন্যান্য বর্ণের সেবা করা।

হিন্দু বর্ণ ব্যবস্থার প্রভাব:

১. সামাজিক স্তরবিন্যাস : বর্ণ ব্যবস্থা হিন্দু সমাজে দীর্ঘকাল ধরে সামাজিক স্তরবিন্যাসের ভিত্তি ছিল। এটি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কর্ম ও দায়িত্ব বিভাজন করত।

২. বৈষম্য : বর্ণ ব্যবস্থা প্রায়ই সামাজিক বৈষম্য এবং নির্যাতনের কারণ হয়ে দাঁড়াত। নিম্নবর্ণের লোকদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হত এবং তাদের অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত।

৩. অচ্ছুৎ : বর্ণ ব্যবস্থার নিম্ন স্তরে অবস্থিত শূদ্রদের চেয়েও নিচে ছিল তথাকথিত "অচ্ছুৎ" বা "অস্পৃশ্য" শ্রেণী, যাদের সাথে অন্য বর্ণের লোকেরা স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকত।

হিন্দুধর্মে বর্ণবাদ সৃষ্টির কারণ :

হিন্দু ধর্মে বর্ণব্যবস্থার উদ্ভব এবং বর্ণবাদের সৃষ্টি একটি জটিল প্রক্রিয়া, যা বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক কারণের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এই ব্যবস্থার সৃষ্টি এবং বিকাশের পেছনে যে কারণগুলি ছিল তা নিম্নরূপ:

১. সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজন:

প্রাচীন সমাজে কার্যকরী কর্মবিভাগ নিশ্চিত করার জন্য বর্ণব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। প্রাথমিকভাবে এটি কর্মভিত্তিক ছিল, অর্থাৎ মানুষ তাদের কাজের উপর ভিত্তি করে বর্ণভুক্ত ছিল। এই ব্যবস্থা সমাজের প্রত্যেক সদস্যের জন্য নির্দিষ্ট কাজ এবং দায়িত্ব নির্ধারণ করত, যা সমাজের কার্যকরী পরিচালনা সহজতর করত।

২. ধর্মীয় গ্রন্থ এবং দর্শন:

হিন্দু ধর্মের প্রাচীন গ্রন্থগুলো যেমন ঋগ্বেদ, মনুস্মৃতি ইত্যাদিতে বর্ণব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে বর্ণিত হয়েছে যে, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে চারটি প্রধান বর্ণের উদ্ভব হয়েছে:

- ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ থেকে,

- ক্ষত্রিয় তার বাহু থেকে,

- বৈশ্য তার উরু থেকে,

- শূদ্র তার পা থেকে।

৩. জাতিগত এবং বর্ণগত পার্থক্য:

আর্যদের ভারতবর্ষে আগমনের পর, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের মিশ্রণের ফলে একটি নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে। আর্যরা নিজেদেরকে উচ্চতর এবং স্থানীয় জনগণকে নিম্নতর মনে করত, যা বর্ণব্যবস্থার এক রূপ দিতে সাহায্য করেছিল।

৪. রাজনৈতিক কারণ:

রাজা এবং শাসকগণ নিজেদের ক্ষমতা স্থিতিশীল করার জন্য বর্ণব্যবস্থাকে সমর্থন করতেন। ক্ষত্রিয় বর্ণের শাসকগণ ব্রাহ্মণদের সম্মান দিয়ে নিজেদের শাসনকাজকে ধর্মীয় স্বীকৃতি প্রদান করতেন। এতে করে শাসনব্যবস্থা আরও দৃঢ় হত।

৫. শিক্ষা এবং জ্ঞান:

ব্রাহ্মণরা ধর্মীয় শিক্ষা এবং জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তারা ধর্মীয় রীতিনীতি এবং সমাজের নৈতিক মানদণ্ড নির্ধারণ করতেন। এই কারণে ব্রাহ্মণদের সামাজিক মর্যাদা এবং ক্ষমতা অনেক বেশি ছিল।

৬. ধর্মীয় কর্তব্য এবং পাপ:

প্রাচীন হিন্দু সমাজে ধর্মীয় কর্তব্য এবং পাপের ধারণা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণব্যবস্থা নির্ধারিত করত কে কোন ধর্মীয় কাজ করতে পারবে এবং কার জন্য কোন কাজ পাপ হিসাবে গণ্য হবে।

৭. উত্তরাধিকারভিত্তিক ব্যবস্থা:

সময়ের সাথে সাথে বর্ণব্যবস্থা উত্তরাধিকারভিত্তিক হয়ে ওঠে। বাবা-মায়ের বর্ণ সন্তানের উপর আরোপিত হত এবং এটি পরিবর্তন করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। ফলে একটি কঠোর সামাজিক স্তরবিন্যাস সৃষ্টি হয়।

৮. শাস্ত্রীয় শাসন:

মনুস্মৃতি এবং অন্যান্য ধর্মীয় শাস্ত্রে বর্ণব্যবস্থাকে কঠোরভাবে পালন করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এর ফলে, বর্ণব্যবস্থার আইন এবং নীতিগুলি ধর্মীয় মান্যতা পায় এবং সমাজে প্রভাব বিস্তার করে।

বর্ণব্যবস্থার এই সৃষ্টি এবং বিকাশের পেছনে প্রধানত উপরের কারণগুলি ছিল। তবে, বর্ণব্যবস্থা প্রাথমিকভাবে কর্মভিত্তিক হলেও, পরে তা কঠোর সামাজিক এবং উত্তরাধিকারভিত্তিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়, যা বর্ণবাদের রূপ নেয়।

হিন্দুধর্ম গ্রন্থে বর্ণ ব্যবস্থার বর্ণনা :

বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে প্রধানত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে :

১.বেদ : বেদে বর্ণ ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্তে (১০.৯০) সমাজের চারটি বর্ণের উত্থান বর্ণিত হয়েছে।

ঋগ্বেদ ১০.৯০.১২

"संक्त्विनस्याभवद् ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहू राजन्य: कृत्वाध्या मध्यम स्योर वैश्य:

पद्भ्यां शूद्रो अजायत॥ "

বাংলা অনুবাদ**:**

"পুরুষসূক্তের এই শ্লোকে উল্লেখ আছে যে, ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি পুরুষের মুখ থেকে, ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি বাহু থেকে, বৈশ্যদের সৃষ্টি উরু থেকে এবং শূদ্রদের সৃষ্টি পা থেকে।"

এই শ্লোক বর্ণপ্রথার উৎপত্তি ও সমাজে বিভিন্ন বর্ণের মানুষের কাজকর্ম ও দায়িত্ব তুলে ধরে।

২.মনু সংহিতা : মনু সংহিতা (বা মনুস্মৃতি) হলো প্রাচীন ভারতীয় ধর্মীয় আইনগ্রন্থ, যেখানে বর্ণ ব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এতে প্রতিটি বর্ণের কর্তব্য এবং আচরণবিধি উল্লেখ করা হয়েছে।মনুসংহিতায় বর্ণপ্রথা নিয়ে বেশ কিছু শ্লোক রয়েছে। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য শ্লোক হলো:

মনুসংহিতা ১.৩১

संक्त्विन्स्वायंभुवं मनुं राजानं चासृजत्प्रभुः।

साधुक्षेमाय ताभ्यां स सर्वं सृष्टं चिकीर्षया॥३१॥

বাংলা অনুবাদ:

"সৃষ্টিকর্তা নিজে স্বায়ম্ভুভ মনু ও রাজা প্রজাপতিকে সৃষ্টি করেছিলেন সমস্ত সৃষ্টির কল্যাণ ও রক্ষার জন্য।"

তবে, বর্ণপ্রথা সম্পর্কে আরও স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে:

মনুসংহিতা ১.৮৭-৯১

संक्त्वब्राह्मणोस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः।

ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत॥৮৭॥

धर्मप्रवक्तारं ब्राह्मणं क्षत्रियं च प्रजापतिः।

वृषालं कर्मणायुक्तं जात्यां वैश्यं शूद्रमेव च॥৮৮॥

स्वायम्भुवो मनुर्नाम्ना धर्मं प्रवक्तुमर्हति।

सर्ववेदमयो धीरः सर्ववेदमयो हितः॥৮৯॥

বাংলা অনুবাদ:

"ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি হয়েছে পুরুষের মুখ থেকে, ক্ষত্রিয়দের বাহু থেকে, বৈশ্যদের উরু থেকে এবং শূদ্রদের পা থেকে। ব্রাহ্মণদের ধর্ম প্রচারকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, ক্ষত্রিয়দের রাজ্য শাসনের, বৈশ্যদের কৃষি ও বাণিজ্যের, এবং শূদ্রদের সেবার কাজ দেওয়া হয়েছে।"

এই শ্লোকগুলি বর্ণপ্রথার প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন বর্ণের দায়িত্ব ও কর্মফল উল্লেখ করে।

৩. ভগবদ্ গীতা : ভগবদ্ গীতায় (৪.১৩) শ্রীকৃষ্ণ বর্ণ ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন, যেখানে বর্ণ গঠনকে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে সৃষ্ট বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।ভগবত গীতায় বর্ণপ্রথা নিয়ে উল্লেখযোগ্য শ্লোক হলো চতুর্বর্ণ প্রণালীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

ভগবদ্গীতা ৪.১৩

संक्त्वचातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।

तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम्॥१३॥

বাংলা অনুবাদ:

"চতুর্বর্ণ প্রথা আমার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে গুণ এবং কর্মের ভিত্তিতে। যদিও আমি এর স্রষ্টা, আমাকে অক্রিয় এবং অবিনশ্বর জেনো।"

এই শ্লোকের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ বোঝাতে চেয়েছেন যে বর্ণপ্রথা গুণ (স্বভাব) এবং কর্মের (কাজের) ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে। এখানে তিনি স্বীকার করেন যে তিনি নিজে এই প্রথার স্রষ্টা, তবে তিনি নিজে কর্মের দ্বারা আবদ্ধ নন।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য শ্লোক হলো:

ভগবদ্গীতা ১৮.৪১

संक्‍्वब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप।

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर गुणैः॥४१॥

বাংলা অনুবাদ:

"হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কাজ তাদের নিজস্ব স্বভাব অনুযায়ী গুণের ভিত্তিতে বিভক্ত।"

এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করে যে বিভিন্ন বর্ণের মানুষের দায়িত্ব এবং কাজ তাদের স্বাভাবিক গুণাবলী অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।

৪.ধর্মশাস্ত্র : বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে বর্ণাশ্রম ধর্মের নীতি ও নিয়মের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে বর্ণপ্রথা নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে শ্লোক রয়েছে। ঋগ্বেদ, মনুসংহিতা এবং ভগবদ্গীতায় আমরা এ সম্পর্কে শ্লোক দেখতে পাই। আগের উত্তরে ঋগ্বেদ, মনুসংহিতা, এবং ভগবদ্গীতার শ্লোকগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও মহাভারতের শান্তি পর্বেও বর্ণপ্রথা নিয়ে কিছু উল্লেখযোগ্য শ্লোক আছে।

মহাভারত, শান্তি পর্ব ১৮৮.১২

संक्त्वब्रह्मणो मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः।

ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत॥१२॥

বাংলা অনুবাদ:

"ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি হয়েছে পুরুষের মুখ থেকে, ক্ষত্রিয়দের বাহু থেকে, বৈশ্যদের উরু থেকে এবং শূদ্রদের পা থেকে।"

মনুসংহিতা ১০.৪

`संक्त्वविद्यया एव सपुत्राः सर्वे त्वं पतितोऽधमः।

शूद्रस्य तु भवेत् धर्मः परत्रनिश्चयः॥४॥

বাংলা অনুবাদ:

"বিদ্যা এবং ধর্মের জ্ঞান অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের মধ্যে পার্থক্য আছে। তবে, শূদ্রদের প্রধান ধর্ম হলো সেবা করা।"

এই শ্লোকগুলি থেকে বোঝা যায় যে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে বর্ণপ্রথা এবং তাদের নির্ধারিত কর্ম এবং দায়িত্বের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণপ্রথার ভিত্তি ও তার কার্যাবলি তুলে ধরা হয়েছে।

খ্রিস্টধর্মে বর্ণবাদ :

খ্রিস্টধর্মে বর্ণবাদ একটি জটিল ও বিতর্কিত বিষয়। খ্রিস্টধর্মের মূল শিক্ষা হলো ভালবাসা, সমতা, এবং মানবতার প্রতি সম্মান। বাইবেলের বিভিন্ন অংশে দেখা যায় যে, মানুষকে একে অপরের প্রতি ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, **গালাতীয় ৩:২৮-এ বলা হয়েছে, "এখানে আর ইহুদী বা গ্রীক নেই, দাস বা স্বাধীন নেই, পুরুষ বা নারী নেই; কারণ তোমরা সকলেই খ্রিষ্ট যীশুর মধ্যে এক।"**

তবে, ইতিহাসে দেখা গেছে যে কিছু খ্রিস্টান সম্প্রদায় এবং ব্যক্তিগতভাবে কিছু খ্রিস্টান, তাদের আচরণে বর্ণবাদের সমর্থন করেছে বা প্রচার করেছে। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকায় দাসপ্রথার সময় অনেক খ্রিস্টান দাসপ্রথার পক্ষে ধর্মীয় যুক্তি দেখাতো। এছাড়া, দক্ষিণ আফ্রিকায় অ্যাপারথাইডের সময়েও কিছু খ্রিস্টান ধর্মীয় দল বর্ণবাদী নীতি সমর্থন করেছিল।বলা বাহুল্য, খ্রিস্টধর্মের মূল শিক্ষা এবং কিছু খ্রিস্টানদের বাস্তব আচরণের মধ্যে একটি বিস্তর ফারাক রয়েছে। যদিও খ্রিস্টধর্মের মূল শিক্ষায় বর্ণবাদের কোন স্থান নেই, ইতিহাসে কিছু খ্রিস্টান এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায় বর্ণবাদী কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিল।

খ্রিস্টধর্মে বর্ণবাদ সৃষ্টির ইতিহাস :

খ্রিস্টধর্ম নিজেই একটি বৈচিত্র্যময় এবং বহুপাক্ষিক ধর্ম যেখানে বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ দেখা গেছে। এখানে কিছু প্রধান দিক উল্লেখ করা হলো যা খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসে বর্ণবাদের সাথে সম্পর্কিত:

১. বাইবেল এবং বর্ণবাদ

বাইবেলের বিভিন্ন অংশে, বিশেষত পুরাতন নিয়মে, কিছু পঙক্তি আছে যা বর্ণবাদের জন্য ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন, নূহের পুত্র হাম-এর অভিশাপের কাহিনী (Genesis 9:20-27) মাঝেমধ্যে বর্ণবাদের বৈধতা প্রদান করতে ব্যবহৃত হয়েছে।

জেনেসিস (উৎপত্তি) বইয়ে নোয়া এবং তার পুত্র হাম-এর গল্প পাওয়া যায়। হাম তার পিতার নগ্নতা দেখে এবং পরে নোয়া হাম এবং তার পুত্র কেনানকে অভিশাপ দেন (জেনেসিস ৯:২০-২৭)। এই অভিশাপকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে অনেক সময় বর্ণবাদকে সমর্থন করা হয়েছে। বাস্তবে, এই গল্পে কোনো নির্দিষ্ট বর্ণ বা জাতির উল্লেখ নেই, এবং এটি বর্ণবাদের সমর্থনে ব্যবহৃত হওয়ার কোনও ভিত্তি নেই।

২. প্রারম্ভিক খ্রিস্টান যুগ

প্রারম্ভিক খ্রিস্টান যুগে খ্রিস্টান ধর্ম একটি বৈশ্বিক ধর্ম হিসেবে বিকাশ লাভ করে, যেখানে ধর্মান্তরিতদের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণ এবং জাতির মানুষ ছিল। তবে, রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে বর্ণ এবং জাতিগত পার্থক্যগুলি বিদ্যমান ছিল।

৩. মধ্যযুগ

মধ্যযুগে, বিশেষ করে ক্রুসেড এবং মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষের সময়ে, বর্ণ এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে ইহুদি ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী আচরণ লক্ষ্য করা যায়।

৪. ঔপনিবেশিক যুগ

খ্রিস্টধর্মের মধ্যে বর্ণবাদের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো ঔপনিবেশিক যুগে ইউরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত দাসপ্রথা। অনেক খ্রিস্টান ধর্মযাজক এবং উপনিবেশকারীরা বাইবেল থেকে উদাহরণ দিয়ে দাসপ্রথার ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন।

৫. আধুনিক যুগ

১৯শ শতাব্দী এবং ২০শ শতাব্দীতে, বিশেষ করে আমেরিকায়, বর্ণবাদী মতাদর্শ খ্রিস্টান ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। যেমন, কিছু গির্জা বর্ণগতভাবে পৃথক ছিল এবং সেগুলিতে কালো এবং সাদা মানুষের আলাদা সেবা প্রদান করা হতো।

বৌদ্ধধর্মে বর্ণবাদ :

বৌদ্ধধর্মে কিছু শ্লোক ও প্রাসঙ্গিক বাণী এমন রয়েছে যাতে ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে বর্ণবাদের আলোচনা আছে।

উল্লেখযোগ্য প্রাসঙ্গিক শ্লোক:

অম্বষ্ঠসূত্র (দিওঘ নিকায়):

"অম্বষ্ঠ, খত্তিয়া উক্কৃষ্টা, খত্তিয়া স্রেষ্ঠা, খত্তিয়া জ্যেষ্ঠা, খত্তিয়া প্রধানা, খত্তিয়া পরমা বৃত্তা, খত্তিয়াদানং ন সম্মতি।"

অনুবাদ: "অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয়েরা উচ্চ, ক্ষত্রিয়েরা শ্রেষ্ঠ, ক্ষত্রিয়েরা প্রধান, ক্ষত্রিয়েরা শ্রেষ্ঠ; ক্ষত্রিয়দের মধ্যে উচ্চ জন্মের কোনো মতভেদ নেই।"

এটি একটি বিতর্কমূলক শ্লোক, যেখানে বুদ্ধ এক ব্রাহ্মণ যুবক অম্বষ্ঠের সাথে কথোপকথনে এই কথা বলেছেন। যদিও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে ক্ষত্রিয়েরা উচ্চ বর্ণের, তবে এই শ্লোকটি মূলত অম্বষ্ঠকে তার অহংকার ও বর্ণভিত্তিক মানসিকতা থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হয়।

ইসলাম**ধর্মে** বর্ণবাদ :

ইসলাম ধর্মের মূল শিক্ষা অনুযায়ী, বর্ণ, জাতি, বা গোত্রের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য করা উচিত নয়। কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন স্থানে এবং বাণীতে সমতা, মানবতা এবং সমস্ত মানুষের প্রতি করুণা প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআন মাজিদে মহান আল্লাহ সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা সুরা আল-হুজুরাত (৪৯:১৩) এর ১৩ নং আয়াতে বলেন :

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সে, যে সর্বাধিক ধার্মিক।"

এই পবিত্র আয়াতটি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মূল্যবান হলো সেই ব্যক্তি, যে সবচেয়ে ধার্মিক, বর্ণ বা জাতি নয়।

হজরত মুহাম্মদ (সা.) বিদায় হজের ভাষণে বলেন :

"হে মানবজাতি, তোমাদের প্রভু এক এবং তোমাদের পিতা এক। একজন আরবের উপর কোনো অনারবের, এবং একজন অনারবের উপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই; একজন সাদা মানুষের উপর কোনো কালো মানুষের, এবং একজন কালো মানুষের উপর কোনো সাদা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব শুধু ধার্মিকতা ও সৎকর্মের ভিত্তিতে।"

এই বিখ্যাত ভাষণটি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সমতা ও ভ্রাতৃত্বের মূল বার্তা বহন করে।ইসলাম ধর্ম মানবতার সমতা ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয় এবং বর্ণবাদ বা জাতিগত বৈষম্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে। ইসলামে একমাত্র শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হলো একজন ব্যক্তির ধার্মিকতা ও আল্লাহর প্রতি তার আনুগত্য।ইসলাম ধর্মের মূল শিক্ষা অনুযায়ী বর্ণবাদ বা জাতিগত বৈষম্যের কোনো স্থান নেই। কুরআন ও হাদিসে বারবার সমতা ও মানবতার কথা বলা হয়েছে। বাস্তব জীবনে কিছু মুসলিম সমাজে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের কারণে বৈষম্যের উদাহরণ পাওয়া গেলেও, এটি ইসলামের মূল শিক্ষার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ইসলামের প্রকৃত বার্তা হলো সকল মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সমতা স্থাপন করা।

ইসলামে বর্ণবাদের বিরোধিতা প্রকাশক কতিপয় আয়াত :

ইসলাম ধর্মে বর্ণবাদের বিরোধীতা প্রকাশ করা হয়েছে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এবং হাদিসে। কুরআনের কিছু উল্লেখযোগ্য আয়াত নিম্নরূপ:

সূরা আল-হুজুরাত (৪৯:১৩)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقۡنٰكُمۡ مِّنۡ ذَكَرٍ وَّاُنۡثٰى وَجَعَلۡنٰكُمۡ شُعُوۡبًا وَّقَبَآٮِٕلَ لِتَعَارَفُوۡا‌ ؕ اِنَّ اَكۡرَمَكُمۡ عِنۡدَ اللّٰهِ اَتۡقٰٮكُمۡ‌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيۡمٌ خَبِيۡرٌ

অর্থ :"হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সে, যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।"

এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে বোঝায় যে আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার জাতি, বর্ণ বা গোত্রের উপর নির্ভর করে না বরং তার ধর্মনিষ্ঠার উপর নির্ভর করে।

সূরা আর-রুম (৩০:২২)

وَمِنۡ اٰيٰتِهٖ خَلۡقُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَاخۡتِلَافُ اَلۡسِنَتِكُمۡ وَاَلۡوَانِكُمۡ‌ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلۡعٰلِمِيۡنَ

অর্থ :"তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

এই আয়াতটি আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে মানুষের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে এবং তা নিদর্শন হিসেবে বর্ণনা করে।

সূরা আন-নিসা (৪:১) :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"হে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর এ উভয়ের মাধ্যমে অনেক পুরুষ ও নারী (বিশ্বে) ছড়িয়ে দিয়েছেন।"

এই আয়াতটি মানুষ সৃষ্টির মূল ভিত্তিকে একক সত্তা হিসেবে বর্ণনা করে, যা মানুষের মধ্যে কোনও বর্ণ বা গোত্রের ভিত্তিতে বৈষম্যকে সমর্থন করে না।

ইসলামের এই আয়াতগুলোতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে আল্লাহর দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান এবং বর্ণ বা জাতিগত পার্থক্য কোনওভাবেই মানুষের মর্যাদা নির্ধারণ করে না।

ইসলামে বর্ণবাদের বিরোধিতা প্রকাশক কতিপয় আয়াত :

ইসলামের প্রাথমিক উৎস কুরআন ও হাদিসে বর্ণবাদ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। নিম্নে কিছু হাদিস উল্লেখ করা হলো যা বর্ণবাদ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলে:

১.হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিদায় হজের ভাষণ :

حَدِيثُ حَجَّةِ الْوَدَاعِ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى. أَبَلَّغْتُ؟ قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."

অর্থ : “হে মানুষ! তোমাদের প্রভু এক ও অভিন্ন। তোমরা সবাই আদমের সন্তান, আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট। একজন আরবের উপর কোনো অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তেমনি একজন অনারবের উপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই; একজন শ্বেতাঙ্গের উপর কোনো কৃষ্ণাঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তেমনি একজন কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোনো শ্বেতাঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব নেই; শ্রেষ্ঠত্ব কেবল পরহেজগারির ভিত্তিতে।” **(মুসলিম, ৬২৬০)**

২. সাহিহ বুখারী ও মুসলিম থেকে বর্ণিত হাদিস:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

“আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক অবস্থা বা ধন-সম্পদ দেখে না, বরং তোমাদের অন্তরের দিকে এবং কাজের দিকে লক্ষ্য করেন।” **(সহিহ মুসলিম, ২৫৬৪)**

৩.তিরমিজি শরীফ থেকে বর্ণিত হাদিস :

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ شَهِدَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَقَالَ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى، أَبَلَّغْتُ؟ قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

“তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা এবং সবাই ভাই ভাই। কেউ কারো প্রতি জুলুম করো না। আরবের উপর অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তেমনি অনারবের উপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই; শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তেমনি কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই; শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে।” **(তিরমিজি, ৩৯৫৫)**

এই হাদিসগুলো ইসলামে বর্ণবাদ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয় এবং মানবজাতির মধ্যে সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে।

বর্ণবাদ ও ইসলাম

অতীতে মুসলিমদের সাথে বর্ণবৈষম্যমূলক আচরণ :

অতীতে মুসলিমদের সাথে বর্ণবাদের ভিত্তিতে আচরণের উদাহরণ বিভিন্ন সময় ও স্থানে পাওয়া যায়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট নিচে তুলে ধরা হলো:

১. ইউরোপ :

ইবেরিয়ান উপদ্বীপ (আন্দালুস) : যখন খ্রিস্টান রাজ্যগুলি পুনরায় আন্দালুস পুনর্দখল করছিল, তখন মুসলিমদের সাথে বর্ণবৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছিল। অনেক মুসলিমকে জোরপূর্বক খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছিল, এবং যারা খ্রিস্টান হতে অস্বীকার করেছিল তাদেরকে দেশান্তরিত বা হত্যা করা হয়েছিল।

উত্তর ইউরোপ: বিশেষ করে মধ্যযুগে, মুসলিম বণিকদের ও পরিব্রাজকদের প্রতি অবিশ্বাস ও শত্রুতা ছিল, যা পরবর্তীতে প্রাচীনপন্থী ইসলামফোবিয়ার রূপ নেয়।

২.ভারত:

ব্রিটিশ শাসন: ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন ও শত্রুতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা ছিল। ব্রিটিশরা মুসলিমদেরকে পিছিয়ে রাখার কৌশল হিসেবে আলাদা শিক্ষা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, যা পরবর্তীতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়িয়েছিল।

৩.আধুনিক যুগ:

পশ্চিমা বিশ্ব : অনেক ইউরোপীয় ও আমেরিকান দেশে মুসলিম অভিবাসীরা বৈষম্য ও বর্ণবাদের শিকার হয়েছে। ৯/১১ সন্ত্রাসী হামলার পরে এই ধরনের আচরণ আরও তীব্র হয়েছে, যা অনেক ক্ষেত্রে ইসলামফোবিয়ার রূপ নিয়েছে।

চীন : চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর মুসলিমরা নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার হয়েছে। তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চর্চা দমিয়ে রাখা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর নজরদারি চালানো হয়েছে।

এইসব উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে এবং ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে মুসলিমদের প্রতি বর্ণবাদ ও বৈষম্যমূলক আচরণ ছিল, যা সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ফেলে।

অন্যান্য ধর্ম**বর্ণের** মানুষের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি **:**

ইসলাম ধর্মে ধর্মের নিয়ে বাড়াবাড়ি করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়। ইসলামে ধর্মের নিয়ম এবং প্রক্রিয়ায় যত্নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসলামের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, সম্মান, ও সহনশীলতা সহযোগিতার মূল্যায়ন করে এবং ধর্মের নিয়ম ও প্রক্রিয়াগুলি মেঝে আসতে বাড়াবাড়ি না করা ব্যক্তিগত এবং সামাজিক দায়িত্বের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। ইসলামে নিজেকে ধর্মীয় প্রক্রিয়ায় মজুদ ধর্মীয় আদর্শ, মৌলিক মূল্যায়ন এবং নির্দিষ্ট নীতি ও নীতিমালা অনুসরণ করা ধর্মীয় জীবনযাত্রার মূল্যবান অংশ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

ইসলাম ধর্মে সহনশীলতা এবং সহানুভূতির মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে, যা অন্যান্য ধর্মের মানুষদের ইসলামের প্রতি মনোনিবেশ প্রদর্শন করতে সাহায্য করে।ইসলাম ধর্মে অন্যান্য ধর্মের প্রতি সম্মান এবং সহযোগিতার মূল্যায়ন করা হয়, এবং বিভিন্ন

ধর্মের প্রতি সহানুভূতি এবং সহযোগিতার বিভিন্ন উদাহরণ রয়েছে।ইসলামের মেজাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ মান হ'ল ধর্মীয় সহযোগিতা এবং সাম্প্রদায়িক সমঝোতার উত্থান। এটি সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির উপর প্রভাব ফেলে এবং বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে সহযোগিতা এবং সম্পর্ক বিকাশে সাহায্য করে।

সম্পর্কিত আয়াতসমূহ :

ধর্মে-বর্ণে বৈচিত্র্য থাকলেও সৃষ্টিগতভাবে সব মানুষই এক। সবাইকে মহান আল্লাহ আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন। সর্বোপরি তিনি মানুষকে সম্মানিত করেছেন এবং সব সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছেন। ইসলাম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম।তথাপি সমাজে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে। এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য ইসলাম বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছে।সেগুলো যথার্থভাবে বাস্তবায়িত হলে পারস্পরিক সুসম্পর্ক, সামাজিক শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকবে, ইন শা আল্লাহ।

বল প্রয়োগ করার নাম ইসলাম নয় বরং ইসলামের সৌন্দর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে যুগে যুগে মানুষ স্বেচ্ছায় ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে।কোনো ধরনের চাপ বা বল প্রয়োগ করে ইসলামে দীক্ষিত করার কোনো বিধান নেই। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

‘দ্বিন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।

(সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৫৬)

ধর্মীয় অধিকার : প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। মুসলিম সমাজেও অমুসলিমরা নিজেদের পরিমণ্ডলে ধর্মীয় উৎসব উদযাপন করবে। অমুসলিমদের যেসব রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান ধর্ম পালনের অংশ, সেগুলোতে মুসলিমদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন,

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

'তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার।' (সুরা : কাফিরুন, আয়াত : ৬)

দেশ রক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তায় সবার অংশগ্রহণ : রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর মদিনায় বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মের অনেক পণ্ডিত স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

হিজরতের পাঁচ মাস পর মদিনা রাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা ও পারস্পরিক সহাবস্থান নিশ্চিত করতে রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় বসবাসকারী অমুসলিমদের সঙ্গে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেন, যা মদিনা সনদ নামে পরিচিত। সনদে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নেতৃত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। যত দিন তারা এ চুক্তি রক্ষা করেছে তত দিন তাদের সঙ্গে মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ বহাল ছিল।

আর্থিক ও অন্যান্য লেনদেন : আর্থিক লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সেবার আদান-প্রদান সব ধর্মের মানুষের সঙ্গে পরিচালনা করতে কোনো বাধা নেই। রাসুলুল্লাহ (সা.) অনেকবার ইহুদিদের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন এবং যথাসময়ে তা পরিশোধ করে দিয়েছেন। একবার একজন ঋণদাতা ইহুদি নির্ধারিত সময়ের আগেই এসে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে খারাপ আচরণ করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কোনো প্রতিবাদ না করে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করতে সাহাবাদের নির্দেশ দেন।

মানবীয় আচরণ : সব মানুষের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ ও মানবীয় আচরণ প্রদর্শন ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। কারণ মানুষ হিসেবে সবাই সমান। আল্লাহ সব মানুষকে সম্মানিত করেছেন। হাদিসে এসেছে, একদিন সাহল ইবনে হুনাইফ (রা.) ও কায়েস

ইবনে সাদ (রা.) কাদেসিয়াতে বসা ছিলেন। তখন তাঁদের পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে কিছু লোক অতিক্রম করল। তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাঁদের বলা হলো, লাশটি অমুসলিমের। তাঁরা বলেন, মহানবী (সা.)-এর পাশ দিয়ে একসময় একটি লাশ নেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে বলা হলো, এটা তো এক ইহুদির লাশ। তখন তিনি বলেন, 'তা কি প্রাণ নয়?' **(বুখারি, হাদিস : ১২৫০)**

পারস্পরিক সহযোগিতা : পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে আসা ইসলামী সমাজব্যবস্থার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। এটি মুসলিম-অমুসলিম সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মহান আল্লাহ বলেন,

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি তাদের সঙ্গে মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।' (সুরা : মুমতাহিনা, আয়াত : ৮)

অসুস্থ হলে শুশ্রূষা করা : অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়াও সুন্নত। নবী (সা.) অমুসলিম রোগীদের দেখতে যেতেন এবং তাদের ঈমানের দাওয়াত দিতেন। তাদের সেবা করতেন। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ইহুদি নবী (সা.)-এর খেদমত করত। সে অসুস্থ হলে নবী (সা.) তাকে দেখতে গেলেন। তার মাথার দিকে বসে নবীজি বলেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। তখন সে তার পিতার দিকে তাকাল। পিতা বলেন, তুমি আবুল কাসেমের (নবীর) অনুসরণ করো। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন নবী (সা.) এই বলে বের হলেন, 'আল্লাহর শুকরিয়া, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।' **(বুখারি, হাদিস : ১২৯০)**

প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা করা : সব ধর্মের মানুষ প্রতিবেশী হতে পারে। প্রতিবেশী যে ধর্মেরই হোক প্রতিবেশী হিসেবে তাদের প্রতি সদয় আচরণ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শনে কোনো প্রকার ত্রুটি করা যাবে না। প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষায় ইসলাম অত্যন্ত তৎপর। ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'জিবরাঈল (আ.) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে অবিরত উপদেশ দিচ্ছিলেন, এমনকি আমি ধারণা করলাম যে, আল্লাহ তাদের ওয়ারিশ বানিয়ে দেবেন।' **(বুখারি, হাদিস : ৫৬৬৮; মুসলিম, হাদিস : ৬৮৫৪)**

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা : আত্মীয় অমুসলিম হলেও সম্পর্ক রক্ষা করতে বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, َ

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

'তোমার মাতা-পিতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে বসবাস করবে সদ্ভাবে।' (সুরা : লোকমান, আয়াত : ১৫)

আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) বলেন, রাসুলের যুগে আমার মা আমার কাছে এলেন মুশরিক অবস্থায়। তখন আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার মা এসেছেন, তিনি অমুসলিম। আমি কি তাঁর আত্মীয়তা রক্ষা করব? নবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করো। **(বুখারি, হাদিস : ২৪৭৭)**

জান-মালের নিরাপত্তা প্রদান : যেসব অমুসলিম মুসলিম দেশে রাষ্ট্রের আইন মেনে বসবাস করে অথবা ভিসা নিয়ে মুসলিম দেশে আসে, তাদের সুরক্ষা এবং জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করল, সে জান্নাতের সুগন্ধও

পাবে না, অথচ তার সুগন্ধ ৪০ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।’ **(বুখারি, হাদিস : ২৯৯৫)**

পরিশেষে বলা যায়, মুসলিম সমাজে উল্লিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত ও বাস্তবায়িত হলে ইসলামের সৌন্দর্য সবাইকে নিঃসন্দেহে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করবে।

সম্পর্কিত হাদিসসমূহ :

ইসলামের মূল উৎস কোরআনে কারিম এবং হাদিস পরধর্মের মানুষকে আপনের চেয়েও বেশি শ্রদ্ধা ও সম্মান করার কথা বলেছে। ইতিহাস সাক্ষী, আমরা দেখেছি শেষ নবী হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আপনজনের অনেকেই ছিল ইসলামের কট্টর দুশমন।ইসলামের মূল উৎস কোরআনে কারিম এবং হাদিস পরধর্মের মানুষকে আপনের চেয়েও বেশি শ্রদ্ধা ও সম্মান করার কথা বলেছে। ইতিহাস সাক্ষী, আমরা দেখেছি শেষ নবী হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আপনজনের অনেকেই ছিল ইসলামের কট্টর দুশমন।তথাপি নবী করিম (সা.) তাদের প্রতি নির্যাতন তো দূরের কথা, তাদের প্রতি মৌখিক অভিযোগও উত্থাপন করেননি। বরং কোনো বিরোধী যখন অসুস্থ হতো, তখন হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে দেখতে যেতেন।

ইসলামের নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, ‘যারা মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার দিকে ডাকে, সাম্প্রদায়িকতার জন্য যুদ্ধ করে, সংগ্রাম করে এবং জীবন উৎসর্গ করে তারা আমাদের দলভুক্ত নয়। ’ **-সুনানে আবু দাউদ : ৫১২৩**

হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘কোনো মুসলমান যদি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অধিকার ক্ষুন্ন করে কিংবা তাদের ওপর জুলুম করে, তবে কেয়ামতের দিন আমি মুহাম্মদ ওই মুসলমানের বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে লড়াই করব। ’ **–সুনানে আবু দাউদ : ৩০৫২**

তিনি (সা.) আরও বলেছেন, ‘অন্যায়ভাবে কোনো অমুসলিমকে হত্যাকারী জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ চল্লিশ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকেই ওই ঘ্রাণ পাওয়া যাবে। ’ **–সহিহ বোখারি : ৩১৬৬**

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে আল্লাহতায়ালা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন। ’ **-সুনানে নাসাঈ : ৪৭৪৭**

রাসূলুল্লাহ (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদিনের চিরাচরিত নিয়ম ছিল, যখন কোনো সেনাবাহিনী প্রেরণ করার প্রয়োজন হতো, তখন যুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন নসিহত, দিকনির্দেশনার পাশাপাশি একথা অবশ্যই বলে দিতেন যে, ‘যুদ্ধকালীন সময়ে বা যুদ্ধের পর কোনো মন্দির-গীর্জা-উপাসনালয় ভেঙে ফেলবে না। ’ -**মুসান্নাফ আবি শায়বা : ৩৩৮০৪**

মুসলিম হওয়ায় সাহাবিদের ওপর কঠিন নির্যাতন

মুশরিকরা বীভৎস উপায়ে মুসলিমদের কষ্ট দিত। যেমন, উট ও গাভির কাঁচা চামড়ার ভেতর জড়িয়ে রোদে ফেলে রাখা, লোহার বর্ম পরিয়ে তপ্ত পাথরের ওপর শুইয়ে রাখা, হাত-পা বেঁধে দুষ্টু ছেলেদের লেলিয়ে দেওয়া, চাবুক দিয়ে পেটাত।

মুশরিকদের নির্যাতন : ইসলামের জন্য প্রথম যুগের মুসলিমদের আত্মত্যাগ অসামান্য। ইসলামগ্রহণের অপরাধে তাদের ওপর মক্কার মুশরিকরা সীমাহীন জুলুম-অত্যাচার চালায়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সর্দাররা নিজ গোত্রের মুসলিমদের লক্ষ্যে পরিণত করে।

মুশরিকদের নির্যাতন থেকে অভিজাত থেকে সাধারণ কোনো শ্রেণির মুসলিমরাই রেহাই পায়নি। ইসলাম গ্রহণের পর উসমান ইবনে আফফান (রা.)-এর চাচা তাঁকে খেজুরের চাটাইয়ের মধ্যে জড়িয়ে ধোঁয়া দিত। মুসআব ইবনে উমায়ের (রা.) অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্য ও

আয়েশের মধ্যে প্রতিপালিত হন। ইসলাম গ্রহণের পর মা তাঁকে ঘর থেকে বের করে দেন এবং পানাহার বন্ধ করে দেন।

ক্ষুধা ও কষ্টে তার শরীর খোলস ছাড়ানো সাপের গায়ের মতো হয়ে যায়।

বেলাল (রা.)-এর ওপর কঠিন নির্যাতন : বেলাল (রা.) ছিলেন উমাইয়া ইবনে খালফের ক্রীতদাস। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে সে বেলাল (রা.)-এর গলায় দড়ি বেঁধে উচ্ছৃঙ্খল বালকদের হাতে তুলে দিত, তাকে নির্মমভাবে প্রহার করত, উত্তপ্ত বালির ওপর শুইয়ে বুকের ওপর ভারি পাথর দিয়ে চাপা দিয়ে রাখত। এমন কঠিন সময়েও বেলাল (রা.) ‘আহাদ’, ‘আহাদ’ (আল্লাহ এক, আল্লাহ এক) বলে চিৎকার করতেন।

দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার, শারীরিক-মানসিক, নির্যাতন সহ্য করা এবং মৃত্য নিশ্চিত জেনে ও সামনে এগিয়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যা কম নয়। তবে এদের মাঝে হজরত বেলাল রা: অন্যতম। কারণ, ইসলাম গ্রহণের কারণে তাকে যে কঠিন অগ্নি পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছিল, অন্য কাউকে এমন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়নি। প্রাথমিক যুগে অমানবিক নির্যাতন সহ্য করে ও এক আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি। তার মা ছিল মক্কার কালো ক্রীতদাসীদের একজন। সে কারণে কেউ কেউ তাকে কালো দাসীর ছেলে বলেও ডাকত। হজরত বেলাল রা: লালিত-পালিত হন মক্কা মুকাররমায়। তিনি ছিলেন আবদুদ-দার গোত্রের কয়েকজন এতিম বালকের ক্রীতদাস। মৃত্যুর আগে তাদের পিতা কাফেরদের নেতা উমাইয়া ইবনে খলফকে তাদের অভিভাবক নিযুক্ত করে যান।

নতুন ধর্ম ইসলামের আলো যখন মক্কা নগরী আলোকিত হয়ে উঠল, মহানবী সা: যখন কালেমার দাওয়াত প্রচার শুরু করলেন, হজরত বেলাল রা: তখন ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। এমন এক সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যখন পৃথিবীর বুকে তিনি এবং কয়েকজন লোক ছাড়া আর কোনো মুসলিমদের অস্তিত্ব ছিল না। ইসলাম গ্রহণকারী প্রভাবশালীদের ওপর মুশরিক নেতৃবৃন্দ কোনো নির্যাতন করার সাহস পায়নি। কারণ, বিপদে-আপদে তাদের পাশে দাঁড়ানোর

মতো শক্তিশালী আত্মীয়স্বজন ছিল। পক্ষান্তরে দুর্বল দাস-দাসীদের পক্ষে দাঁড়ানোর মতো কোনো আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব ছিল না। ফলে অসহায়- দুর্বলদের ওপর কুরাইশ নেতারা চাপিয়েছে নির্যাতনের পাহাড়। এ অসহায় লোকদের ওপর নির্যাতন চালানোর দায়িত্ব নিয়ে ছিল একদল কঠিন ও নির্দয় কুরাইশি কাফের। আবু জাহল হজরত সুমাইয়্যা রা:কে হত্যা করে এ দায়িত্ব পালনে সর্বপ্রথম কৃতিত্ব দেখায়। দায়িত্বপ্রাপ্ত ওই পাষণ্ড হৃদয় কাফেরদের অত্যাচার ছিল চরম অমানবিক। বেলাল রা:কে নির্যাতন করার দায়িত্ব নিয়েছিল উমাইয়া ইবনে খলফ এবং তার পাষাণ হৃদয়ের কিছু সঙ্গী। তারা চাবুকের আঘাতে তাকে রক্তাক্ত করত আর তিনি বলতেন, আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়। আহাদ, আহাদ। তারা তার বুকের ওপর চাপিয়ে দিত বড় বড় পাথর আর যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তিনি বলতেন, আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়। আহাদ, আহাদ।

তারা যতই তার কষ্টকে তীব্র করে তুলত তিনি বলতেন, এ একটি কথাই। আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়। আহাদ, আহাদ। তারা তাকে জোরাজুরি করত লাত, উজ্জা দেবদেবীর নাম নিতে। কিন্তু তিনি অবিরাম শুধু আল্লাহ ও মুহাম্মদ নামই উচ্চারণ করতেন। তারা বলত, আমরা যেভাবে আমাদের দেবদেবীর নাম জপ করি তুইও সেভাবে কর। বেলাল রা: জবাবে বলতেন, ওইগুলো আমি ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারি না। এ কথা শুনেই তারা তাকে আরো বেশি কষ্ট দিত। আরো ভয়ঙ্কর নির্যাতন চালাত। পাপিষ্ঠ উমাইয়া যখন নির্যাতন চালাতে চালাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ত, তখন হজরত বেলাল রা:-এর গলায় মোটা রশি বেঁধে দুষ্ট বালকদের হাতে তুলে দিয়ে বলত, একে মক্কার পাহাড়ি উঁচু-নিচু পথে ঘুরিয়ে নিয়ে এসো। আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার অপরাধে বেলাল রা:কে যখন এভাবে গলায় রশি বেঁধে নেয়া হতো, এই কষ্ট তার কাছে খুব মজাদার লাগত। তিনি তখন ঈমানের প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করতেন আর জান্নাতি সঙ্গীত গাইতেন আহাদ, আহাদ। আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়। তিনিই আমার রব। তিনিই আমার সব। অবিরাম চলতে থাকত তার মুখের এই সুমধুর সুর। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করুন।

নির্যাতনের মুখে আম্মার (রা.)-এর পরিবার : ইসলামের জন্য আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা.)-এর পরিবারের আত্মত্যাগ অবিস্মরণীয়। তিনি ছিলেন বনু মাখজুমের ক্রীতদাস। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ও তাঁর পিতা ভয়াবহ নির্যাতনের মুখোমুখি হন। তাদের উত্তপ্ত রোদে মরুভূমির ওপর শুইয়ে রাখা হতো।

একদিন এমন সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, 'হে ইয়াসার পরিবার, ধৈর্যধারণ করো, তোমাদের ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত।' অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ইয়াসার (রা.) ইন্তেকাল করেন এবং আবু জাহেল লজ্জাস্থানে তীর নিক্ষেপ করে আম্মার (রা.)-এর আম্মা সুমাইয়া (রা.)-কে শহীদ করে দেন। ইসলামের জন্য তিনিই ছিলেন প্রথম শহীদ।

মনিবের নির্যাতনের মুখে খাব্বাব (রা.) : খাব্বাব ইবনে আরত (রা.) খোজায়া গোত্রের উম্মে আনসার নামে এক নারীর ক্রীতদাস ছিলেন। পৌত্তলিকরা তাঁর ওপর নানাভাবে নির্যাতন চালাত। পৌত্তলিকরা তাঁকে মাটির ওপর টানত, তাঁর মাথার চুল ধরে টানত এবং ঘাড় মটকে দিত, কয়েকবার জ্বলন্ত কয়লার ওপর শুইয়ে বুকে চাপা দিয়ে রাখত। জিন্নিরাহ নাহদিয়া, তাদের কন্যা ও উম্মে উবাইস ছিলেন ক্রীতদাসী, সুহাইব রুমি (রা.) ছিলেন আবদুল্লাহ বিন জারআনের মুক্ত করা দাস। তারাও পৌত্তলিকদের কঠোর নির্যাতনের মুখোমুখি হন।

মুসলিমদের ওপর নির্যাতন : পৌত্তলিকরা বীভৎস উপায়ে মুসলিমদের কষ্ট দিত। যেমন, উট ও গাভির কাঁচা চামড়ার ভেতর জড়িয়ে রোদে ফেলে রাখা, লোহার বর্ম পরিয়ে তপ্ত পাথরের ওপর শুইয়ে রাখা, হাত-পা বেঁধে দুষ্টু ছেলেদের লেলিয়ে দেওয়া, চাবুক দিয়ে পেটাত। (আর-রাহিকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা ১০৭-১০৮; নবীয়ে রহমত, পৃষ্ঠা ১৩২-১৩৪; মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস : ১/২৯৮-৩০১)

প্রথম দিকের সাহাবিদের বিশেষ সম্মাননা : মক্কায় ঈমানি পরীক্ষায় আত্মত্যাগী সাহাবিদের 'সাবিকুনাল আউয়ালুন' (সুরা তাওবা, আয়াত : ১০১) হিসেবে উল্লেখ করা

হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইন্তেকালের আগে ‘সাবিকুনাল আউয়ালুন’ (প্রথম সারির মধ্যে অগ্রগামী) সাহাবিদের ব্যাপারে বলেন, “মুহাজিরদের মধ্যে ‘সাবিকুনাল আউয়ালুন’ এবং তাদের পরে তাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদের অসিয়ত করছি। যদি তোমরা তা (সম্মান ও সদ্ব্যবহার) না করো তবে তোমাদের দান ও ন্যায়পরায়ণতা গ্রহণ করা হবে না।” (জামিউল মাসানিদ ওয়াস-সুনান, হাদিস : ৬০৯২)

যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি তাঁর সৈন্যদের শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ রাখতেন এবং শত্রুর প্রতি যেন কোনো অন্যায় আচরণ করা না হয়, সে ব্যাপারে তাঁর বাহিনীকে সতর্ক করে দিতেন। যেমন—তিনি অসুস্থ ব্যক্তি, নারী ও শিশুকে আক্রমণ করতে, যুদ্ধবন্দিদের ওপর তরবারি চালাতে, তাদের হত্যা করতে এবং বিজিত অঞ্চলে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে নিষেধ করেছেন।

ধর্ম**বর্ণ** ভেদে শত্রুদের সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর আচরণ

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি কাজ মানবজাতির জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শত্রু, মিত্র নির্বিশেষে সবার সঙ্গে ন্যায়সংগত আচরণ করতেন। এমনকি শত্রুর প্রতিও তিনি কোনো অন্যায় আচরণ করতেন না।

বরং তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করতেন।

শত্রুদের প্রতি মহানবী (সা.) কখনো প্রতিহিংসাপরায়ণ হতেন না। বিনা কারণে তাদের প্রতি চড়াও হতেন না এবং একেবারে নিরুপায় না হলে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতেন না। অস্ত্র ধারণের পূর্বে তাদের সঠিক পথে আসার আহ্বান জানাতেন অর্থাৎ তাঁর প্রস্তাব মেনে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানাতেন।

শত্রুপক্ষ তাঁর প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি তাঁর সৈন্যদের শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ রাখতেন এবং শত্রুর প্রতি যেন কোনো অন্যায় আচরণ করা না হয়, সে ব্যাপারে তাঁর বাহিনীকে সতর্ক করে

দিতেন। যেমন—তিনি অসুস্থ ব্যক্তি, নারী ও শিশুকে আক্রমণ করতে, যুদ্ধবন্দিদের ওপর তরবারি চালাতে, তাদের হত্যা করতে এবং বিজিত অঞ্চলে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে নিষেধ করেছেন।

মহানবী (সা.)-এর দুই ধরনের শত্রু ছিল।প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শত্রু। প্রকাশ্য শত্রুর মধ্যে ছিল মূলত মক্কার কাফেররা, যারা মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর ইসলাম প্রচার শুরু করলে তাঁর বিরোধিতা করতে থাকে। অপ্রকাশ্য শত্রুর মধ্যে ছিল মুনাফেক, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা। মক্কার জীবনে মহানবী (সা.) কাফেরদের প্রকাশ্য বিরোধিতা, অপমান ও নির্যাতন মুখ বুঝে সহ্য করেছেন। তিনি কখনো তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেননি, এমনকি তাদের সঙ্গে রাগান্বিত হয়ে কখনো উচ্চ স্বরে কথাও বলেননি।

বরং তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করেছেন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলে মদিনাবাসী তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে এবং তাঁকে মদিনা প্রজাতন্ত্রের সভাপতি বা নেতা নির্বাচিত করে। এ সময় মদিনায় বসবাসরত ইহুদি ও খ্রিস্টানরা মহানবী (সা.)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তাঁর নেতৃত্বকে মেনে নেয়। কিন্তু ইহুদি ও খ্রিস্টানরা পরবর্তী সময় গোপনে মহানবী (সা.)-এর বিরোধিতা করতে থাকে, বিশেষ করে ইহুদিরা মক্কার কাফেরদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাদের এ ষড়যন্ত্র এক সময় প্রকাশ পেলেও মহানবী (সা.) তাদের প্রতি কোনো কঠোর আচরণ করেননি। ন্যায়সংগতভাবে তাদের শাস্তি প্রদান করেছেন।

মহানবী (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় শত্রুদের বিরুদ্ধে মোট ২৭টি যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। তন্মধ্যে ৯টি যুদ্ধে তিনি সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধগুলোর বেশির ভাগই ছিল কাফেরদের বিরুদ্ধে। এসব যুদ্ধ থেকে শত্রুর প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। মহানবী (সা.)-এর জীবনের প্রথম যুদ্ধ ছিল বদরের যুদ্ধ, যা মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। মদিনায় মহানবী (সা.)-এর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্মান বৃদ্ধি পেলে মক্কার কাফেররা তাঁকে ও তাঁর প্রচারিত ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয়। মহানবী (সা.) উপায়ান্তর না দেখে তাদের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে মাত্র ৩১৩ জন সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলে বদর নামক স্থানে তাদের

মধ্যে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা ইতিহাসে বদরের যুদ্ধ নামে পরিচিত। এ যুদ্ধে মহানবী (সা.) ধৈর্য, শৃঙ্খলা ও মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কাফেরদের মুখোমুখি হলে প্রথমে তিনি শত্রুদের ইসলাম গ্রহণ করে এক আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের আহ্বান জানান। কাফেররা তা প্রত্যাখ্যান করলে তিনি আরবের প্রচলিত যুদ্ধরীতি অনুসারে প্রথমে তাদের মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানান। কাফেরদের পক্ষে উতবা, শায়বা ও ওয়ালিদ অগ্রসর হলে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে বীর কেশরী হামজা, আলী ও আবু উবায়দা সম্মুখ থেকে অগ্রসর হন। মল্লযুদ্ধে কাফেররা পরাজিত হলে উপায়ান্তর না দেখে তাদের বীর সেনাপতি আবু জেহেল মুসলমানদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। ফলে উভয় পক্ষে একটি খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হয়। এ যুদ্ধে আবু জেহেলসহ ৭০ জন কুরাইশ নিহত হয় এবং ৭০ জন বন্দি হয়। অন্যদিকে ১৪ জন মুসলমান শাহাদতবরণ করে। বন্দিদের প্রতি মহানবী (সা.) যে উদার ও মধুর ব্যবহার করেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। মাত্র দুজন গুরুতর অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, অন্য সবার প্রতি উদার ব্যবহার করা হয়। হজরত মুহাম্মদ (সা.) কুরাইশ বন্দিদের অনির্দিষ্টকালের জন্য আবদ্ধ না রেখে মুক্তিপণ গ্রহণ করে মুক্তি দেন। মাত্র চার হাজার দিরহাম মুক্তিপণ নির্ধারিত হয়। আর যারা মুক্তিপণ দিতে অক্ষম ছিল, তাদের পরে তিনি বিনা শর্তেই মুক্তিদান করেন। মানবতার ইতিহাসে পরম শত্রুর প্রতি এরূপ উদারতা ও মহানুভবতা পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

ওহুদের যুদ্ধের সময় ইহুদিদের বনু নাজির গোত্র বিশ্বাসঘাতকতা করলে ক্রোধেরবশে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করে মহানবী (সা.) তাদের মদিনা থেকে বহিষ্কার করেন। খন্দকের যুদ্ধে কাফেরদের মিত্র বাহিনী পরাজিত হলে তিনি বনু কুরায়জা গোত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এবার তিনি তাদের বিচারের ভার নিজ হাতে না নিয়ে তাদেরই নেতা সাদ ইবনে মু'আজের ওপর ন্যস্ত করেন। সাদ ইহুদি ধর্মগ্রন্থ অনুসারে বনু কুরাইজা গোত্রের পুরুষদের হত্যা, স্ত্রী-পুত্র ও বালক-বালিকাদের দাস-দাসী হিসেবে ব্যবহার এবং তাদের ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার রায় দেন। নিজের

হাতে বিচার ও শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও স্বগোত্রীয় নেতার ওপর বিচারের ভার অর্পণ করে তিনি অত্যন্ত উদারতা ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। মক্কা বিজয়ের পর তাঁর পরম শত্রুদের হাতের মুঠোয় পেয়েও তিনি কোনোরূপ রক্তপাত না ঘটিয়ে তাদের বিনা শর্তে ক্ষমা করে দেন। শত্রুদের প্রতি এরূপ ক্ষমার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি নেই। মহানবী (সা.) যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ছিলেন এবং তিনি যে সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ আবির্ভূত হয়েছিলেন শত্রুদের প্রতি তাঁর এসব আচরণে আরো স্পষ্ট হয়েছে।

ধর্মবর্ণভেদে অমুসলিমদের সঙ্গে যেমন ছিল নবীজির আচরণ

মানবতার নবী ও বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) তার উম্মতকে সদা এই নির্দেশই দিয়েছেন তারা যেন ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবার সঙ্গে উত্তম আচরণ করে।

মহানবীর (সা.) অতুলনীয় জীবনাদর্শ থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরার চেষ্টা করব যাতে আমরা সহজেই বুঝতে পারি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে তার ব্যবহার কেমন ছিল।

হজরত আবুবকর (রা.)এর কন্যা আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মহানবীর (সা.) যুগে আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এলেন। আমি মহানবীকে (সা.) জিজ্ঞেস করলাম- আমি কি তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করব?

তিনি (সা.) বললেন, হ্যা' (সহিহ বোখারি)। হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, 'একদা এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করলো। লোকেরা উঠে (তাকে মারার জন্য) তার দিকে গেল। মহানবী (সা.) বললেন, তার পেশাব বন্ধ করো না। তারপর তিনি (সা.) এক বালাতি পানি আনলেন এবং পানি পেশাবের ওপর ঢেলে দেয়া হল' (সহিহ বোখারি, কিতাবুল আদব)।

মহানবীর (সা.) আদর্শ এতটাই অতুলনীয় ছিল যে তিনি ইহুদীর লাশকেও সম্মান দেখিয়েছেন। হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, একবার এক ইহুদীর লাশ বিশ্বনবীর (সা.) সামনে

দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আর এতে মহানবী (সা.) সেই লাশের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে ছিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না লাশটি তার সামনে থেকে চলে যায়।

পাশ থেকে হজরত জাবের (রা.) বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল! এটি তো ইহুদীর লাশ। এতে আল্লাহর রাসুল উত্তর দিয়েছিলন, সে কি মানুষ ছিল না? (সহিহ বোখারি, হাদিস নং ১৩১১)।

যে নবী এক ইহুদীর লাশকে সম্মান জানানোর জন্য তার সাথিদেরকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সেই নবীর উম্মতের পক্ষে কিভাবে সম্ভব শুধু ধর্মীয় মতপার্থক্যের কারণে কারো ওপর অন্যায় অত্যাচার করা।

হজরত সুফিয়ান ইবনে সালিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'মনে রেখো যদি কোনো মুসলমান অমুসলিম নাগরিকের ওপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার কোনো বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকদের পক্ষাবলম্বন করব' (আবু দাউদ)।

হজরত আবু বাকারা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন' (মুসনাদে আহমদ)। এছাড়া মহানবী (সা.) এটিও বলেছেন, 'তোমরা মজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থেকো, যদিও সে কাফির হয়। তার মাঝখানে আর আল্লাহর মাঝখানে কোনো পর্দা নেই (অর্থাৎ তার বদদোয়া দ্রুত কবুল হয়ে যায়)' (মুসনাদে আহমদ)।

এছাড়া আমরা লক্ষ্য করি মানব সেবায় আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তির প্রতিও মহানবী (সা.) শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন ও তাদের খেয়াল রাখতেন। একবার তাঈ গোত্রের লোকেরা মহানবীর (সা.) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। এতে তাদের কিছু সংখ্যক লোক বন্দী হয়ে এসেছিল। তাদের মধ্যে আরবের প্রসিদ্ধ দাতা হাতেমের এক মেয়েও ছিল। যখন সে মহানবীর (সা.) কাছে বললো, সে হাতেম-তাঈর মেয়ে, এ কথা শুনে মহানবী (সা.)

তার সঙ্গে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে ব্যবহার করলেন এবং তার সুপারিশক্রমে তার গোত্রের শাস্তি ক্ষমা করে দিলেন' (সীরাত হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ-২২৭)।

আমরা যদি সেই সময়ের ঘটনা লক্ষ্য করি যখন মক্কার লোকেরা মহানবীর (সা.) কোন কথাই যখন শুনতে চাচ্ছিল না, তখন তিনি (সা.) তায়েফের দিকে দৃষ্টি দিলেন। যখন তিনি (সা.) তায়েফ পৌছলেন, তখন সেখানকার নেতৃবৃন্দ তার সাথে দেখা করার জন্য আসতে লাগলো। কিন্তু কেউই সত্য গ্রহণ করতে রাজী হলো না। সাধারণ লোকেরাও তাদের নেতাদেরই অনুসরণ করল এবং খোদার বাণীর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করতে লাগলো।

এখানে ঘটনা সংক্ষেপ করছি, কেননা-আপনাদের সকলেরই এ ঘটনা জানা আছে। পরিশেষে তারা সব ভবঘুরে ছেলে ছোকরাদেরকে একত্রিত করলো। তারা প্রত্যেকেই ঝোলা ভর্তি পাথরের টুকরা নিল। তারা নির্মমভাবে মহানবীর (সা.) ওপর পাথর ছুঁড়তে থাকে।

অবিশ্রান্তভাবে পাথর মারতে মারতে মহানবীকে (সা.) শহর থেকে বাইরে নিয়ে গেল। শ্রেষ্ঠ রাসুলের দু'টি পা রক্তাক্ত হয়ে উঠলো। তারপরও তারা ঠান্ডা হলো না, যতক্ষণ না তিনি (সা.) শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি পাহাড়ে এসে পৌছলেন। এই লোকগুলো যখন তার পিছু পিছু ধাওয়া করছিল, তখন তিনি এই ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলেন যে, আল্লাহর গজব না আবার তাদের ওপর পড়ে।

তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখছিলেন এবং কাতর প্রাণে প্রার্থনা করছিলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি এদেরকে ক্ষমা করে দাও! কেননা এরা জানে না, এরা কি করছে।' একটু ভেবে দেখুন, আঘাতে জর্জরিত ও লোকদের তাড়া খেয়ে তার শরীরে চলার মত আর শক্তি ছিল না। এত কিছুর পরও তিনি (সা.) তাদের অভিশাপ দেননি বরং তাদের জন্য দোয়াই করেছেন।

এমনই ছিলো মানবদরদী রাসুল, শ্রেষ্ঠ রাসুল মহানবীর (সা.) আদর্শ। আমরা যদি মহানবীর (সা.) জীবনাদর্শ পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাই, তিনি কতইনা উত্তম আচরণ করেছেন অন্যান্যা ধর্মাবলম্বীদের সাথে আর একই শিক্ষা আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। তিনি (সা.) যে দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

তাই এরূপ আজিমুশ্বান নবীর (সা.) ওপর লক্ষ লক্ষ দরূদ ও সালাম। ইয়া রাব্বি সাল্লি আলা নাবিয়্যেকা দায়েমান ফি হাযিহিদ্দুনিয়া ওয়া বাসিন সানী। আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে বিশ্বনবীর (সা.) জীবনাদর্শ অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন, আমিন।

একটি বিশেষ ঘটনা :

নবিজী সা. এর পিতা আব্দুল্লাহ।একদিন মক্কার বাজারে গেলেন কিছু কেনা-কাটা করার জন্য ।এক জায়গায় তিনি দেখলেন, এক লোক নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে কিছু দাস-দাসী বিক্রি করছে ।আব্দুল্লাহ কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন।দাস-দাসীদের কাতারে দাঁড়িয়ে ছিলেন নয় বছরের একটি কালো আবিসিনিয়ার মেয়ে তাকে দেখে আব্দুল্লাহর অনেক মায়া হলো মেয়েটি একটু রুগ্ন, হালকা-পাতলা গড়নের,কিন্তু কেমন যেন মায়াবী ও অসহায় দৃষ্টিতে তাঁকিয়ে আছে ।আব্দুল্লাহ সদ্য বিবাহিত।ঘরে স্ত্রী আমেনা একাক্যী থাকেন।ভাবলেন, স্ত্রীর একজন সঙ্গী দরকার। এই ভেবে তিনি মেয়েটাকে কিনে নিলেন ।মেয়েটিকে আব্দুল্লাহ ও আমেনা অনেক ভালোবাসতেন ।খুব আদর স্নেহ করতেন ।তারা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন যে, তারা তাদের সংসারে আগের চেয়ে অনেক বেশি বারাকাহ পাচ্ছেন।তাই তারা আদর করে মেয়েটিকে নাম দিলেন "বারাকাহ"।

একদিন আব্দুল্লাহব্যবসার কারণে সিরিয়া রওনা দিলেন ।আমেনার সাথে সেটাই ছিল উনার শেষ বিদায় ।এর দুই/এক দিন পর আমেনা স্বপ্নে দেখলেন, আকাশের আলোকোজ্জ্বল একটি তারা যেন তার কোলে এসে পড়লো ।তিনি বারাকাকে স্বপ্নের

কথা বললেন।উত্তরে বারাকা মৃদু হেসে বললেন, "আমার মন বলছে আপনার একটা সুন্দর সন্তান হবে"।আমেনা তখনও জানতেন না,তিনি গর্ভধারণ করেছেন। কিছুদিন পর বুঝতে পারলেন, বারাকার ধারণাই সত্যি ।আব্দুল্লাহ আর ফিরে আসেন নি, সিরিয়ার পথেই মৃত্যুবরণ করেছেন । আমেনার সেই বিরহ ও কষ্টের সময়ে, বারাকাহ ছিলেন তার একমাত্র কাছের সঙ্গী ।একসময় আমেনার অপেক্ষা শেষ হয়, এবং তিনি জন্ম দিলেন শিশু মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে। সর্বপ্রথম প্রিয় নবীকে দেখার ও স্পর্শ করার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই আফ্রিকান ক্রিতদাসী ছোট কালো মেয়েটির।নিজ হাতে তিনি শিশু মুহাম্মাদকে আমেনার কোলে তুলে দিয়েছিলেন,আর আনন্দে ও খুশিতে বলেছিলেন,'আমি কল্পনায় ভেবেছিলাম তিনি হবেন চাঁদের মত, কিন্তু এখন দেখছি, তিনি চাঁদের চেয়েও সুন্দর'।

নবীজির জন্মের সময় উনার বয়স ছিল তের বছর ।নবীজীর ছোটবেলায় তিনি আমেনার সাথে তাঁর যত্ন নিয়েছেন, গোসল দিয়েছেন, খাওয়াতে সাহায্য করেছেন, আদর করে ঘুম পাড়িয়েছেন।আমেনার মৃত্যুর সময় তিনি বারাকাহ এর হাত ধরে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন তাঁর সন্তানকে দেখে শুনে রাখেন ।বারাকাহ জীবনভর তাই করেছিলেন ।বাবা-মা দুজনকেই হারিয়ে ইয়াতিম মুহাম্মাদ (সা.) চলে আসলেন দাদা আবদুল মোত্তালিবের তত্বাবধানে।এবার উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি হলেন বারাকার নতুন মনিব ।কিন্তু তিনি একদিন বারাকাকে মুক্ত করে দিলেন। বললেন,'আপনি যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পারেন,আপনি স্বাধীন ও মুক্ত'।বারাকাহ শিশু মুহাম্মাদকে (সা.) ছেড়ে যেতে রাজি হলেন না।রয়ে গেলেন, মায়ের ছায়া হয়ে পাশে থেকে গেলেন।এমনকি নবীজির দাদা উনাকে বিয়ে দেয়ার জন্য বেশ কয়েকবার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না। উনার কথা ছিল, 'আমি আমেনাকে কথা দিয়েছি, আমি কোথাও যাবো না'।একদিন খাদিজা (রা.) এর সাথে নবীজির বিয়ে হলো। বিয়ের দিন নবীজি (সা.) খাদিজা (রা.) এর সাথে বারাকাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন,বললেন, 'উনি হলেন আমার মায়ের পর আরেক মা'।বিয়ের পর রাসূল (সা.) একদিন বারাকাহ-কে ডেকে বললেন, 'উম্মি ! আমাকে দেখাশুনা করার জন্য এখন খাদিজা আছেন, আপনাকে এখন বিয়ে করতেই হবে'। (নবীজি উনাকে উম্মি ডাকতেন, নাম ধরে ডাকতেন না)।তারপর রাসূল (সা.) ও খাদিজা (রা.) মিলে তাকে উবাইদ ইবনে জায়েদের সাথে

বিয়ে দিয়ে দিলেন।কিছুদিন পর বারাকাহ এর একজন ছেলে হলো, নাম রাখলেন আইমান ।এরপর থেকে বারাকাহ নতুন নামে পরিচিত হলেন, 'উম্মে আইমান'।একদিন বারাকাহ স্বামী উবাইদ মৃত্যু বরণ করেন।নবীজি গিয়ে আইমান ও বারাকাহ-কে সাথে করে নিজের বাড়ি নিয়ে আসেন এবং সেখানেই থাকতে দিলেন ।কিছুদিন পর নবীজি(সা.) বেশ কয়েকজন সাহাবীকে ডেকে বললেন,'আমি একজন নারীকে জানি, যার কোন সম্পদ নেই, তিনি বয়স্ক এবং সাথে একটা ইয়াতিম সন্তান আছে,কিন্তু তিনি জান্নাতি।তোমাদের মধ্যে কেউ কি একজন জান্নাতি নারীকে বিয়ে করতে চাও?'এইকথা শুনে জায়েদ ইবনে হারিসা

(রা.) নবীজির কাছে এসে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন ।নবীজি (সা.)উম্মে আইমানের সাথে কথা বলে বিয়ের আয়োজন করলেন ।বিয়ের দিন রাসূল (সা.) জায়েদকে বুকে জড়িয়ে আনন্দে ও ভালোবাসায়, ভেজা চোখে, কান্না জড়িত কণ্ঠে বললেন, জায়েদ জানো, তুমি কাকে বিয়ে করেছো? 'হাঁ, উম্মে আইমানকে', জায়েদ উত্তর করলেন। নবীজী বললেন, ...তুমি যাকে বিয়ে করেছো তিনি আমার মা!.সাহাবীরা বলতেন, রাসূল (সা.)-কে খাওয়া নিয়ে কখনো জোর করা যেত না ।উনি সেটা পছন্দ করতেন না ।কিন্তু উম্মে আইমান একমাত্র নারী, যিনি রাসূল (সা.) কে খাবার দিয়ে "খাও".." খাও".. বলে তাড়া দিতেন।আর খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাশে বসে থাকতেন। নবীজি মৃদু হেসে, চুপ চাপ খেয়ে নিতেন ।

রাসূল (সা.) স্বিয় দুধ মাতা হালিমাকে দেখলে যেমন করে নিজের গায়ের চাদর খুলে বিছিয়ে তার উপর তাকে বসতে দিতেন,ঠিক তেমনি মদিনায় হিজরতের পর দীর্ঘ যাত্রা শেষে উম্মে আইমান যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।নবীজি তাঁর গায়ের চাদরের একটা অংশ পানিতে ভিজিয়ে, উম্মে আইমানের মুখের ঘাম ও ধুলোবালি নিজ হাতে মুছে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'উম্মি ! জান্নাতে আপনার এইরকম কোন কষ্ট হবে না'। নবীজি(সা.) মৃত্যুর আগে সাহাবীদের অনেক কিছুই বলে গিয়েছিলেন। সেই সব কথার মধ্যে একটা ছিল, উম্মে আইমানের কথা।তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা উম্মে আইমানের যত্ন নিবে, তিনি আমার মায়ের মত।তিনিই একমাত্র নারী, যিনি আমাকে জন্ম থেকে

শেষ পর্যন্ত দেখেছেন,তিনি আমার পরিবারের একমাত্র সদস্য, যিনি সারাজীবন আমার পাশে ছিলেন’।সাহাবীরা সেই কথা রেখেছিলেন।

.গায়ের রং নয়, এক সময়ের কোন ক্রিতদাসী নয়, তাঁর পরিচয় ছিল, তিনি নবীজীর আরেক মা।ফলে সাহাবায়ে কিরাম আপন মায়ের মতোই এই বৃদ্ধা নারীকে ভালোবেসে আগলে রেখেছিলেন । আবু বকর উমার রা. মাঝে মাঝেই তাকে দেখতে যেতেন,আর তাঁর খোঁজখবর নিতেন।

ইসলামে দাসপ্রথা ও এই সম্পর্কিত ভুলধারণা এবং এর খণ্ডন :

দাসপ্রথা ইসলাম প্রবর্তিত কোন ব্যবস্থা নয়। আজ হতে প্রায় পৌনে ৪০০০ বছর আগের ব্যবলনিয় Code of Hammurabi-তেও দাসপ্রথার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। কিন্তু কেন যেন ইসলামের সমালোচনায় দাসপ্রথা একটি বেশ মুখরোচক বিষয়বস্তুতে পরিণয় হয়, আর আলোচনার ভঙ্গিটাও এমন থাকে যাতে পাঠকের কাছে মনে হতে থাকবে দাসপ্রথার মত ঘৃণ্য একটি ব্যবস্থাকে ইসলাম জন্ম দিয়েছে বা উন্নীত করেছে। অথচ আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ইসলাম দাসপ্রথার মতো একটি বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নিয়েছিল, ক্রীতদাসকে ভাতৃত্বের যে মর্যাদা দিয়েছিল, নেতৃত্বের যে সুযোগ দিয়েছিল, যে কোন নিরপেক্ষ বিশ্লেষক তার প্রশংসা না করে পারবে না।

কুরআন এবং হাদিসে দাস-দাসি ও দাসপ্রথার অবস্থান

মূল আলোচনায় যাবার আগে আসুন কুরআনের কিছু আয়াত এবং কিছু হাদিস থেকে দাস-দাসি ও দাসপ্রথার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝবার চেষ্টা করি।

কুরআনের কিছু আয়াত:

আয়াত-১: দাসমুক্তকরণ ধর্মের ঘাঁটি

অতঃপর সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। আপনি জানেন, সে ঘাঁটি কি? তা হচ্ছে দাসমুক্তি অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান- এতীম আত্মীয়কে অথবা ধুলি-ধুসরিত

মিসকীনকে, অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সবরের ও উপদেশ দেয় দয়ার। [৯০:১১-১৭]

আয়াত-২: মুক্তিকামি ক্রীতদাসের জন্য সম্পদ ব্যয় করা বড় সৎকাজ

সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রসূলগণের উপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্নীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। [২:১৭৭, প্রাসঙ্গিক অংশ]

আয়াত-৩: নিজেদের সমান হয়ে যাবার ভয়ে দাস-দাসীদের দান না করা আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করার নামান্তর

আল্লাহ তাআলা জীবনোপকরণে তোমাদের একজনকে অন্যজনের চাইতে শ্রেষ্টত্ব দিয়েছেন। অতএব যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে, তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে স্বীয় জীবিকা থেকে এমন কিছু দেয় না, যাতে তারা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যাবে। তবে কি তারা আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করে। [১৬:৭১]

আয়াত-৪: নিঃস্ব হলেও সৎকর্মপরায়ণ দাস-দাসীদের বিবাহ দিয়ে দিতে হবে তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ন, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। [২৪:৩২]

দাসদাসি ও দাসপ্রথা সম্পর্কিত কিছু হাদিস:

হাদিস-১: স্বাধীন ব্যক্তিকে কেনাবেচা নিষিদ্ধকরণ

আবু হুরাইরা(রা.) হতে বর্ণিত:

নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ[তায়ালা] বলেন:

আমি কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিরূদ্ধে হবো,

[১] যে আমার নামে শপথ করে অত:পর বিশ্বাসঘাতকতা করে,

[২] যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে (ক্রীতদাস হিসেবে) বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করে,

[৩] যে কোন মজুরকে নিযুক্ত করে তার থেকে পরিপূর্ণ কাজ গ্রহণ করে অথচ তার পারশ্রমিক প্রদান করে না।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর ২২২৭; ইংরেজি অনুবাদ: ভলি ৩, বুক ৩৪, নম্বর ৪৩০; http://sunnah.com/urn/20920]

হাদিস-২: দাস-দাসির অধিকার

আল-মা'রুর বিন সুওয়াইদ(রা.) হতে বর্ণিত:

[রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] বললেন:

তোমাদের দাসেরা তোমারদের ভাই যাদের ওপর আল্লাহ তোমাদের ক্ষমতা দিয়েছেন। কাজেই কারো নিয়ন্ত্রণে যদি তার ভাই থাকে, তবে সে যা খাবে তাকেও তাই খাওয়াবে, সে যা পরবে তাকেও তাই পরাবে। তাদের ওপর অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপাবে না যা তারা বহন করতে অক্ষম। যদি তা করো, তবে তাদেরকে সাহায্য কর।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর ২৫৪৫ (প্রাসঙ্গিক অংশ); ইংরেজি অনুবাদ: ভলি ৩, বুক ৪৬, নম্বর ৭২১; http://sunnah.com/bukhari/49#2]

হাদিস-৩: দাস-দাসিকে সম্মানজনকভাবে সম্বোধন করা

আবু হুরাইরা(রা.) হতে বর্ণিত:

নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তোমাদের কেউ যেন [এভাবে সম্বোধন করে] না বলে, 'তোমার প্রভুকে খাওয়াও', 'তোমার প্রভুকে অযু করাও', 'তোমার প্রভুকে পান করাও'; বরং বলবে, 'আমার মুনিব (সাইয়্যিদ)' বা 'আমার অভিভাবক (মাওলা)'। আর তোমাদের কেউ যেন না বলে 'আমার দাস/বান্দা (আবদ)' বা 'আমার দাসী/বান্দী (আমাত)'; বরং বলবে 'আমার বালিকা (ফাতাত)' এবং 'আমর বালক (গুলাম)'।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর ২৫৫২; ইংরেজি অনুবাদ: ভলি ৩, বুক ৪৬, নম্বর ৭২৮; http://sunnah.com/urn/23920]

হাদিস-৪: দাস-দাসির ন্যায়বিচার লাভের অধিকার

সামুরাহ(রা.) হতে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যদি কেউ তার ক্রীতদাসকে হত্যা করে আমরা তাঁকে হত্যা করবো, আর কেউ যদি তার ক্রীতদাসের নাক কেটে দেয়, আমরাও তার নাক কেটে দেবো।

[সুনান আবু দাউদ, হাদিস নম্বর ৪৫১৫; ইংরেজি অনুবাদ: বুক ৩৯, নম্বর ৪৫০১; http://sunnah.com/abudawud/41#22]

হাদিস-৫: দাস-দাসির ওপর অপবাদ আরোপের পরিণাম

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত:

আমি আবুল ক্বসিম(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, কেউ যদি তার ক্রীতদাসকে অপবাদ দেয় আর সেই ক্রীতদাস যদি সে যা বলছে তা হতে মুক্ত হয়, তবে তাকে (অপবাদ আরোপকারিকে) কিয়ামতের দিনে বেত্রাঘাত করা হতে থাকবে যতক্ষণ না সেই ক্রীতদাস তাই হয় যা সে বর্ণনা করেছে।

[সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর ৬৯৪৩, ইংরেজি অনুবাদ: ভলি ৮, বুক ৮২, নম্বর ৮৪১; http://sunnah.com/urn/64520]

হাদিস-৬: দাস/দাসিকে চপেটাঘাত করার শাস্তি

মুআবিয়া বিন সুওয়াইদ হতে বর্ণিত:

আমি আমাদের এক ক্রীতদাসকে চপেটাঘাত করি, অত:পর পলায়ন করি। আমি ঠিক মধ্যাহ্নের আগে ফিরে এলাম এবং আমার পিতার পেছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি তাকে (ঐ ক্রীতদাসকে) এবং আমাকে ডাকলেন এবং বললেন: সে তোমার প্রতি যা করেছে, তুমিও তেমন করো. সে [ক্রীতদাস] আমাকে মাফ করে দিল। তখন তিনি

(আমার পিতা) বললেন, রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবদ্দশায় আমরা মুকাররিনের পরিবারভুক্ত ছিলাম এবং আমাদের একজন মাত্র ক্রীতদাসি ছিল। আমাদের একজন তাকে চড় মারলো। এই খবর রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে পৌঁছল এবং তিনি বললেন: তাকে মুক্ত করে দাও। তারা (পরিবারের লোকজন) বললেন: সে ছাড়া আমাদের আর কোন সাহায্যকারি নেই। কাজেই তিনি বললেন: তাহলে তাকে কাজে নিযুক্ত করো, আর যখনই তোমরা তাকে কাজ হতে অব্যাহতি দিতে সমর্থ হও, তাকে মুক্ত করে দাও।

[সহিহ মুসলিম, হাদিস নম্বর ৪৩৯১; ইংরেজি অনুবাদ: বুক ১৫, নম্বর ৪০৮১; http://sunnah.com/urn/240810]

হাদিস-৭: দাসিকে বিবাহে উৎসাহ প্রদান

আবু মুসা(রা.) হতে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

যার একটি ক্রীসদাসি আছে আর সে তাকে শিক্ষাদীক্ষা দান করে, তার সাথে সদয় ব্যবহার করে, অত:পর তাকে মুক্ত করে বিবাহ করে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। [সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর ২৫৮৪; ইংরেজি অনুবাদ: ভলি. ৩, বুক ৪৬, নম্বর ৭২০; http://sunnah.com/urn/23840]

দাসত্বের পথ এবং ইসলাম

সর্বশেষ আসমানী কিতাব কুরআন যখন নাযিল হচ্ছিল তখন শুধু আরবে নয় বরং সারা দুনিয়ায় ক্রীতদাসপ্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। স্বাধীন মানুষ দাসত্ব বরণ করত প্রধানত দুটি উপায়ে:

১. স্বাধীন ব্যক্তিকে বেচাকেনার মাধ্যমে ক্রীতদাস বানানো: এই পথটি ইসলামে চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইসলামে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে কেনাবেচা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। [দ্রষ্টব্য: হাদিস-১]

২. যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাস বানানো:

যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাস বানানো সেই সময় একটি স্বাভাবিক রীতি ছিল। কোন মুসলিম যদি যুদ্ধে অমুসলিমদের হাতে বন্দী হতো তাকেও এই পরিণতি বরণ করতে হতো। ইসলামে যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাস বানানো কোন জরুরী বিষয় নয়। ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করতে পারে, বিনা মুক্তিপণেও মুক্ত করতে পারে, যুদ্ধবন্দি বিনিময় করতে পারে বা প্রয়োজনবোধে অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের রীতি অনুসারে দাস-দাসীও বানাতে পারে। তবে কোন রাষ্ট্রের সাথে মুসলিমদের যদি এমন কোন চুক্তি থাকে যে তারা তাদের যুদ্ধবন্দীদের দাস বানাতে পারবে না, তবে সেই চুক্তি রক্ষা করা মুসলিমদের জন্য জরুরি।

কেন ইসলামে এই সুযোগ রহিত করা হলো না?

ইসলাম একটি বাস্তব ধর্ম। ইসলাম এমন কোন ধর্ম না যে কেউ এক গালে চড় মারলে আরেকটা গাল পেতে দিতে বলবে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নিজ অনুসারিদের বিপদ বা অস্তিত্ব সংকটের মুখে ফেলে দেবার ধর্ম ইসলাম নয়। যেখানে মুসলিমরা অমুসলিমদের হাতে যুদ্ধবন্দী হলে তাদেরকেও দাসত্ব বরণ করতে হতো, সেখানে ইসলাম যদি একই সুযোগ না রাখতো তবে তা হতো শত্রুর হাতে এক বিরাট মারণাস্ত্র তুলে দেওয়ার নামান্তর। কাজেই যতদিন মুসলিমদের জন্য এই নিশ্চয়তা না আসে যে তাদের যুদ্ধবন্দীদের দাসদাসী বানানো হবে না, ততদিন পর্যন্ত মুসলিমদের জন্যও এই সুযোগ রহিত করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

দাসত্বের এই পথ বন্ধ করার উপায়

ইসলামে দাসত্ব বরণের এই পথটি যদিও খোলা রয়েছে তবে একটি বন্ধযোগ্য পথ, যা বন্ধ করার চাবি অমুসলিম রাষ্টসমূহের হাতেই দেওয়া আছে। যে কোন অমুসলিম রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে এই ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যে ‘আমরা একে অপরের যুদ্ধবন্দীদের দাস-দাসী বানাবো না’, দাসত্বে প্রবেশের এই উন্মুক্ত পথটি বন্ধ করে দিতে পারে।

ইসলামে দাসমুক্তির পথসমূহ

১. যাকাত: ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ যাকাত। আর এই যাকাতের একটা খাত নির্ধারণ করা হয়েছে দাসমুক্তির জন্য। [দ্রষ্টব্য ৯:৬০]

২. কাফফারা: বিভিন্ন গুনাহ বা ভুলের কাফফারা নির্ধারণ করা হয়েছে দাস মুক্তকরণকে। [দ্রষ্টব্য ৫:৮৯, ৫৮:৩, ৪:৯২]

৩. লিখিত চুক্তি: ইসলাম দাস-দাসিদের তার মালিকের সাথে মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তির অনুমতি প্রদান করেছে।

তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে অর্থ-কড়ি দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। [২৪:৩৩, প্রাসঙ্গিক অংশ]

৪. ক্ষতিপূরণ: কোন দাস/দাসিকে চপেটাঘাত করা হলে তার শাস্তি হিসেবে উক্ত দাস/দাসিকে মুক্ত করে দিতে হবে। [দ্রষ্টব্য: হাদিস-৬]

৫. দাসমুক্তকরণে উৎসাহ প্রদান:

দাসমুক্তিকে একটি বিরাট সওয়াবের কাজ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। [দ্রষ্টব্য: আয়াত-২]

- বিভিন্ন প্রাকৃতিক নির্দশনের সময় দাসমুক্তির নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, যেমন; চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ কালে। [দ্রষ্টব্য: সহিহ বুখারি, ইংরেজি অনুবাদ: ভলি.২, বুক ১৮, নম্বর ১৬৩; ভলি.৩, বুক ৪৬, নম্বর ৬৯৫; ভলি.৩, বুক ৪৬, নম্বর ৬৯৬]

- মুক্তিকামি দাসদাসীদের অর্থকড়ি প্রদান করে সাহায্য করতে বলা হয়েছে। [দ্রষ্টব্য ২৪:৩৩]

-মালিকের অধিক পছন্দনীয় এবং অধিক দামী দাস-দাসীর মুক্তিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা স্বাভাবিকভাবে কম থাকে। তাই ঘোষণা করা হয়েছে যে, সর্বোত্তম দাসমুক্তি হচ্ছে

সবচেয়ে দামী এবং মালিকের অধিক পছন্দনীয় দাসকে মুক্ত করা। [দ্রষ্টব্য: সহিহ বুখারি, ইংরেজি অনুবাদ: ভলি ৩, বুক ৪৬, নম্বর ৬৯৪]

-দাস-দাসি নিজের সমান হয়ে যাবে এমন আশঙ্কায় যারা তাদের দান করা থেকে বিরত থাকে তাদের তিরস্কার করা হয়েছে। [দ্রষ্টব্য ১৬:৭১]

-কোন ক্রীতদাস যদি একাধিক মালিকের আয়ত্বাধীনে থাকে এবং কোন একজন মালিক তার অংশ হতে ঐ দাসকে মুক্ত করে দেয় তবে উক্ত মালিকের জন্য ঐ ক্রীতদাসকে অপর অংশীদারদের হতেও মুক্ত করে দেওয়াকে জরুরী করে দেওয়া হয়েছে। মালিক তাতে অসমর্থ হলে, উক্ত ক্রীতদাসকে মুক্তি লাভের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করার নিমিত্তে কাজ করার অনুমতি দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। [দ্রষ্টব্য: সহিহ বুখারি, ইংরেজি অনুবাদ ভলি. ৩, বুক ৪৪, নম্বর ৬৭২]

- দাসিকে শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে মুক্ত করে বিবাহকারীকে দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী বলা হয়েছে। [দ্রষ্টব্য: হাদিস-৭]

ইসলামে দাস/দাসী'র অধিকার ও মর্যাদা

১. ভ্রাতৃত্বের মর্যাদা:

ইসলাম দাসদের ভাইয়ের মর্যাদায় উন্নীত করেছে। [দ্রষ্টব্য: হাদিস-২]

২. নেতৃত্বের অধিকার:

ইসলামে দাসও আমীর হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তাকে মান্য করা সকলের জন্য জরুরি। [দ্রষ্টব্য: সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর ৭২২৯; ইংরেজি অনুবাদ: ভলি ৯, বুক ৮৯, নম্বর ২৫৬; http://sunnah.com/urn/67120]

৩. অন্ন-বস্ত্রের সমানাধিকার:

৩.১ মুনিব যা খাবে দাসকেও তাই খাওয়াতে হবে। [দ্রষ্টব্য: হাদিস-২]

৩.২ মুনিব যা পরবে দাসকেও তা-ই পরাতে হবে। [দ্রষ্টব্য: হাদিস-২]

৪. কাজ-কর্মে সহানুভূতি লাভের অধিকার:

৪.১ দাসের ওপর তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কোন কাজের বোঝা চাপানো যাবে না। [দ্রষ্টব্য: হাদিস-২]

৪.২. দাসের ওপর অতিরিক্ত কোন কাজের বোঝা দিতে হলে নিজেকেও তাতে সাহায্য করতে হবে। [দ্রষ্টব্য: হাদিস-২]

৫. সম্মান লাভের অধিকার:

৫.১ দাস-দাসীদের ‘আমার বান্দা/দাস’ ‘আমার বান্দি/দাসী’ বলা যাবে না, বলতে হবে ‘আমার বালক’, 'আমার বালিকা'। [দ্রষ্টব্য: হাদিস-৩]

৫.২ দাস-দাসীদের চপেটাঘাত পর্যন্ত করা যাবে না। তাদেরকে চপেটাঘাত করা হলে এর শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে মুক্ত করে দিতে হবে। [দ্রষ্টব্য: হাদিস-৬]

৫.৩ দাস-দাসীদের ওপর কোন অপবাদ আরোপ করা যাবে না। [দ্রষ্টব্য: হাদিস-৫]

৬. ধর্মীয় মর্যাদা:

ইসলামে একজন দাসের ধর্মীয় মর্যাদা একজন স্বাধীন মুসলিমের চেয়ে কোন অংশে কম নয় বরং বেশি। কেননা, যদি কোন দাস তার মালিকের প্রতি সৎ এবং বিশ্বস্ত

থাকে এবং তার প্রভুর (আল্লাহর) ইবাদতও যথাযথভাবে করে তবে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। [দ্রষ্টব্য: সহিহ বুখারি, ইংরেজি অনুবাদ ভলি ৩, বুক ৪৬, নম্বর ৭২২]

৭. ন্যায়বিচার লাভের অধিকার:

ইসলাম ক্রীতদাসের ন্যায়বিচার লাভের অধিকারকে নিশ্চিত করে। বিশ্বে যেখানে দাসদের ওপর চলছিল ইচ্ছামত অত্যাচার, নিপীড়ণ; দাসদের হত্যা করাও যখন ছিল আইনসিদ্ধ, সেই সময় ইসলাম ঘোষণা করে কঠোরতম সতর্কবাণী, কেউ কোন ক্রীতদাসকে হত্যা করলে তাকেও হত্যা করা হবে, কেউ কোন ক্রীতদাসের অঙ্গহানি ঘটালে তারও অঙ্গহানি ঘটানো হবে। [দ্রষ্টব্য: হাদিস-৪]

৮. জৈবিক চাহিদা পূরণের অধিকার:

ইসলাম দাস-দাসীদের জৈবিক চাহিদা পূরণের অধিকার নিশ্চিত করেছে এবং নিজের দাস-দাসীদের বিবাহ দিয়ে দেওয়াকে মুনিবের জন্য দায়িত্ব হিসেবে নির্ধারণ করেছে। [দ্রষ্টব্য ২৪:৩২]

৯. পবিত্র জীবন যাপনের অধিকার:

ইসলামে দাসীদের পতিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত করা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য কারো না। [২৪:৩৩, প্রাসঙ্গিক অংশ]

১০. বিবাহের ক্ষেত্রে মতামত প্রদানের অধিকার:

কোন মুনিব তার ক্রীতদাসির সাথে আলোচনা না করে তাকে কারো সাথে বিবাহ দিতে পারবে না। [দ্রষ্টব্য: বুখারি, হাদিস নম্বর ৭০৫৬; ইংরেজি অনুবাদ: ভলি ৯, বুক ৮৬, নম্বর ১০০; http://sunnah.com/urn/65560]

১১. ক্রীতদাসি এবং তার শিশুর একত্রিত থাকার অধিকার:

কোন ক্রীতদাসীকে ভিন্ন কোথাও বিক্রি করে তার থেকে তার শিশুকে বিচ্ছিন্ন করার কোন অনুমতি ইসলামে নেই, এবং এই ধরণের বেচাকেনা নিষিদ্ধ। [দ্রষ্টব্য: সুনান আবু দাউদ, ইংরেজি অনুবাদ: বুক ১৪, নম্বর ২৬৯০]

এতক্ষণ তো দেখলেন প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ইসলামে দাস/দাসীদের অবস্থান কোথায় ছিল। এবার মাত্র কয়েক শতক আগে পাশ্চাত্যের Slave code-এ দাস/দাসীদের আইনসিদ্ধ অবস্থান কোথায় ছিল তার একটু নমুনা দেখা যাক:

Virginia, 1705 – "If any slave resists his master...correcting such a slave, and shall happen to be killed in such correction...the master shall be free of all punishment...as if such accident never happened."

Alabama, 1833, section 31 – "Any person or persons who attempt to teach any free person of color, or slave, to spell, read, or write, shall, upon conviction thereof by indictment, be fined in a sum not less than two hundred and fifty dollars, nor more than five hundred dollars."

Alabama, 1833, section 32 – "Any free person of color who shall write for any slave a pass or free paper, on conviction thereof, shall receive for every such offense, thirty-nine lashes on the bare back, and leave the state of Alabama within thirty days thereafter..."

Alabama, 1833, section 33 – "Any slave who shall write for any other slave, any pass or free-paper, upon conviction, shall receive, on his or her back, one hundred lashes for the first offence, and seven hundred lashes for every offence thereafter..."

South Carolina, 1712–No slave shall be allowed to work for pay, or to plant corn, peas or rice; or to keep hogs, cattle, or horses; or to own or operate a boat; to buy or sell; or to wear clothes finer than 'Negro cloth'

[সূত্র এখানে: http://en.wikipedia.org/wiki/Slave_codes]

অর্থাৎ দাসদের পড়া-লেখা শেখার, মজুরি খাটার, কিছু উৎপাদন করার, গবাদি পশু রাখার, নৌকা রাখা/চালানোর, কেনা-বেচা করার, ভালো কাপড় পরিধান করার অধিকারই শুধু হরণ করা হয় নাই, মালিককে এতটুকু অধিকারও দেওয়া হয়েছিল যে যদি ক্রীতদাসকে সংশোধন করতে গিয়ে সে তাকে মেরেও ফেলে, তবু তার কোন শাস্তি হবে না, যেন এমন কোন ঘটনাই ঘটে নাই!

এরপরও যদি কেউ দাসপ্রথার কথা এলেই ইসলামের দিকে আঙুল উঁচু করতে চান, তবে বলতেই হবে, যারা চোখ বন্ধ করে ঘুমান তাদের জাগাবার সাধ্য কারো নেই।

জাতি বর্ণের বিভেদ: নবীজী **(সল্লাল্লহু '**আলা**হি** ওয়া সাল্লাম)যে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন

মানুষ মানুষই। এরচেয়ে বড় আর কোনো পরিচয় মানুষের নাই। আল্লাহ মানুষকে সম্মানিত করেছেন, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মাখলুক বানিয়েছেন।

এক আদম ও হাওয়া থেকে মানবজাতির সূচনা। গোত্র, বর্ণ, শ্রেণি, পেশা ও ভাষার বৈচিত্র কালের আবর্তনে তৈরি হয়েছে শুধু পরিচয়ের মাধ্যম হিসেবে। সাদা- কালো, ধনী-গরিব, বংশীয় উঁচু নিচু মানুষের সম্মান ইজ্জত বাড়ায়ও না, কমায়ও না।

আল্লাহতায়ালা বিভিন্ন জাতি ও গোত্র এজন্যে সৃষ্টি করেন নি যে, তারা পরস্পর হানাহানি ও ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হবে, একে অপরকে অভিসম্পাত করবে, একে অন্যের ওপর গর্ব ও অহমিকা প্রদর্শন করবে।

ইসলাম ধন সম্পদ, বাহ্যিক রূপ সৌন্দয্য, বংশীয় কৌলিণ্য, সামাজিক প্রতিপত্তি কিংবা দৈহিক শক্তি সামর্থকে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি বানায় নি। গরিবের ওপর ধনীর, দুর্বলের ওপর সবলের, নিচু বংশের ওপর উচ্চ বংশের, কালোর ওপর সাদার কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য ইসলাম রাখেনি।

ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে, ‘শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার ভিত্তি হল তাকওয়া বা খোদাভীতি।’ এই তাকওয়া নিজের ভেতর যে যতটুকু ধারণ করবে সে তত শ্রেষ্ঠ হবে। তত মর্যাদাবান হবে।

নানা গোত্র বর্ণ ভাষার বৈচিত্র সবই পরিচয় ও চেনার সুবিধার জন্যে মাত্র। আল্লাহতায়ালা বলেন, হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে

চিনতে পার। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান সেই যে তোমাদের মধ্যে বেশি তাকওয়া অবলম্বনকারী। (হুজুরাত ৪৯ : ১৩)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অনারবিদের ওপর আরব দেশের লোকের, আরব দেশের লোকের ওপর অনারবিদের কোনো মর্যাদা নেই। কৃষ্ণাঙ্গের ওপর লাল বর্ণের লোকের, লাল বর্ণের লোকের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সম্মান মর্যাদা কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। (মুসনাদে আহমদ ২৩৪৮৯)

আল্লাহতায়ালা ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোরআন ও হাদিসে এই উম্মতের জন্য এমন সব বিধি-বিধান দিয়ে রেখেছেন, যার মাধ্যমে পুরো উম্মাহর ঐক্য সংহতি মজবুত ও সুদৃঢ় হয়। তারা আকার আকৃতি, দেশ বর্ণে ভিন্ন হয়েও ঈমানের দাবিতে, ইসলামের দাবিতে সবাই হবে অভিন্ন।

আল্লাহতায়ালা ভাষা, বর্ণ, দেশ বা রাষ্ট্রকে ঐক্যের সূত্র বানান নি। তাদের ঐক্যের ভিত্তি বানিয়েছেন একমাত্র দীনকে। এই দীনের সূত্রে তারা এক হয়ে থাকবে। বিচ্ছিন্ন হবে না।

দীন তাদেরকে সংশোধন করবে। তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে। তাদের থেকে আসাবিয়াত জাত্যাভিমান জাতিগর্ব বর্ণবাদ শ্রেণিবিভেদ দূর করবে। হাপর যেমন লোহার মরিচা দূর করে।

কেউ কেউ সব কিছুকে তাদের মন মত ব্যাখ্যা করে, বিবেক বুদ্ধি দিয়ে নয় বরং প্রবৃত্তির চাহিদা মত। আল্লাহতায়ালা তার প্রজ্ঞা ও হেকমত মাফিক যেভাবে চান সেভাবে নয়। তারা সম্পূর্ণ ত্রু টিপূর্ণ একটি মতবাদ দাঁড় করিয়েছে।

যার ফলশ্রুতিতে জাতিগর্ব, বর্ণবাদ, শ্রেণি বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছে। আসাবিয়্যাত, জাত্যাভিমান, গোত্র, দল ও জাতিগত বিভেদর ভয়ংকর এক অদৃশ্য প্রাচীর মানবতার সামনে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

আসাবিয়াত বা অন্যায় পক্ষপাতদুষ্টতা মানুষের ভেতর ভিন্ন জাতি গোষ্ঠি ও বর্ণের মানুষের প্রতি হিংসা ও জিঘাংসার চারা বুনে। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে, এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণের লোককে, এক দেশের মানুষ অন্য দেশের মানুষকে ঘৃণা করে, তুচ্ছ ভাবে, গালমন্দ করে। এটি চরম অমানবিক ও স্পষ্ট পাপাচার।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা কোন ব্যক্তির নিকৃষ্ট হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। (সহিহ মুসলিম ২৫৬৪)

আসাবিয়াত মানুষকে সংকীর্ণমনা করে তুলে। সে নিজে ও তার সমমনা ছাড়া অন্য কাউকে সহ্য করতে পারে না। এর বিপরীত হলো উদারতা যা ব্যক্তিকে করে সুপ্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারি।

সব মুমিনের জন্যে তার দিলে থাকে দরদ ব্যথা। দীনের মৌলিক নীতিমালা আঁকড়ে ধরে, সবাইকে সে ভালবেসে যায়, যে গোত্র বা বর্ণেরই হোক, তাদের মাঝে কাঁটাতার পাহাড় পর্বত সাগর নদীর যত বাধাই থাকুক, পথ যতই দূরের হোক, মতের যত অমিলই হোক, চিন্তা ও কর্ম পদ্ধতির যতই বৈচিত্র থাকুক।

মুমিন এমনই হয়। মুমিনকে এমনই হতে হয়।

নিজ গোষ্ঠি দল মত বা কাঁটাতারের সীমারেখার অন্যায় পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তি বরাবরই রিপুর দ্বারা তাড়িত থাকে। অন্ধত্ব ও বধিরতা হয় তার নিত্যসঙ্গী। সে কখনও ন্যায়নিষ্ঠ সহনশীল ধীরস্থির ও মধ্যপন্থী হতে পারে না।

সবসময়ই নিজের প্রবৃত্তির অন্ধ অনুসারি হয়ে থাকে। নিজেই নিজের গুণমুগ্ধ থাকে। মুমিন কখনও এমন হতে পারে না। মুমিনের এমন হওয়া সাজে না।

যে যত বড়ই হোক সবার মাঝেই কম বেশি ভুল ত্রুটি থাকে। আসাবিয়াতে আক্রান্ত ব্যক্তি অন্যের তিল পরিমাণ দোষ দেখে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে, পক্ষান্তরে তার নিজের অসীম পর্বতসম পাপের খবরই থাকে না অথবা কেয়ারই করে না। সারাদিন অন্যের দোষ ত্রুটি চর্চা করে বেড়ায় অথচ এরচে মারাত্মক অপরাধের আসামী সে নিজে।

অন্যায় পক্ষপাত চরম নিকৃষ্ট কাজ। যা জাহেলি কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের সৌন্দর্য এখানেই যে, এসব গর্হিত কাজকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহতায়ালা তোমাদের থেকে জাহেলি যুগের অহংকার, বাপদাদাদের নিয়ে অহমিকা দূর করে দিয়েছেন। হয়তো মুমিন মুত্তাকি, নয়তো দুর্ভাগা পাপী। তোমরা সবাই আদম সন্তান। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে। লোকেরা যেন তাদের সম্প্রদায়কে নিয়ে অহমিকা ত্যাগ করে! (সুনানে আবু দাউদ ৫১১৬)

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, আমরা এক জিহাদে ছিলাম। এক মুহাজির সাহাবি আনসারি সাহাবিকে আঘাত করলে আনসারি বলে ওঠেন, ওহে আনসারিগণ! তদ্রুপ মুহাজিরও বলেন, কোথায় মুহাজির সাহাবিরা!

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা শুনে বললেন, এ তো দেখছি জাহেলিয়্যাতের ডাকাডাকি! এটা কী! তাকে বিস্তারিত ঘটনা বলা হল। তিনি বললেন, এসব ছেড়ে দাও। এগুলো নিকৃষ্ট কাজ। (সহিহ বুখারি ৪৯০৫)

নবীজির সাহচর্যধন্য সোনার মানুষ সাহাবা ও তাদের পদাঙ্ক অনুসারি তাবিয়ীরা নবীজির শিক্ষা ও আদর্শকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। কখনও জাত্যাভিমান, জাতিগর্ব, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, রং বা বংশের বড়াই তাদের স্পর্শ করতে পারে নি। আর না তা সম্ভব ছিল।

তাদের পরে উম্মাহর বিশিষ্ট চার ইমামের কেউই তাদের মতের অন্যায় পক্ষাবলম্বন করেন নি। তারা ইখলাস ও পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে কোরআন হাদিস ও শরিয়তের অন্যান্য উৎস থেকে ফিকহ সংকলন করেছেন। গবেষণা করে যা সঠিক ও অগ্রগণ্য মনে হয়েছে তাই সংকলন করেছেন।

এক্ষেত্রে কোন কিছুই তাদেরকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারে নি। দোর্দণ্ড জালেম শাসক থেকে নিয়ে নিজের কুপ্রবৃত্তি, কোন কিছুই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে নি, ইতিহাস সাক্ষী।

একই চিত্র আমরা দেখতে পাই পূর্বসূরি অন্যান্য আলেম ওলামা ও বুযর্গদের মাঝে। কেউই নিজের দল মত তরিকা পথ ও পন্থার পক্ষে অন্যায় কোন পদক্ষেপ নেন নি। না-হক তরফাদারি করেন নি।

ইবনুল কায়্যিম (রহ.) এর একটি বক্তব্য দিয়ে আমি এই নিবন্ধের ইতি টানব, তিনি বলেন, জাতি বা গোত্রের অন্যায় পক্ষপাত, মাযহাব, নির্দিষ্ট দল ও মত পথের জন্যে আসাবিয়্যাত, পীর মাশায়েখদের জন্যে অন্যায় তরফদারি এবং এগুলোর পক্ষেই (বিভ্রান্তিমূলক) প্রচার প্রচারণা চালানো, এসবের ভিত্তিতেই শত্রু মিত্রের জোট বাঁধা- জাহেলিয়্যাত বা জাহেলি কুসংস্কার।

আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে দেশ জাতি গোত্র বর্ণ বংশ দল মত নির্বিশেষে, সবকিছুর ঊর্ধ্বে ওঠে ইসলাম ও ঈমানের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, ঐক্য সম্প্রীতি ও সংহতি গড়ে তোলার তাওফিক দান করুন। আমীন।

ধর্মবর্ণভেদে বর্তমান নেতাদের আচরণ ও রাসূল (সল্লাল্লহু **'**আলাইহি **ওয়া** সাল্লাম)এর **শিক্ষা**

ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূল মুহাম্মদ (সা.) সমতার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বর্ণ, জাতি বা সামাজিক স্তরের পার্থক্য ভেদাভেদ না করে সকল মানুষের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা প্রদর্শন করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের কেউই প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেই জিনিসটি কামনা করে যা সে নিজের জন্য কামনা করে।" (সহিহ বুখারি)

বর্তমান সময়ে কিছু নেতাদের আচরণ রাসূল (সা.) এর শিক্ষার সাথে বিরোধপূর্ণ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ:

১.বর্ণবৈষম্য : কিছু নেতার আচরণে বর্ণ বা জাতি ভিত্তিক বৈষম্য দেখা যায়, যা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী।

২. অবিচার ও অন্যায় : রাসূল (সা.) সর্বদা ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের উপর জোর দিয়েছেন। কিছু বর্তমান নেতা তাদের ক্ষমতা বজায় রাখতে অবিচার ও অন্যায় পন্থা অবলম্বন করে থাকেন।

৩. ভোগবিলাস ও অহংকার : রাসূল (সা.) বিনম্র ও সাধারণ জীবন যাপন করতেন। অন্যদিকে, অনেক নেতার জীবনযাপন বিলাসিতা ও অহংকারে পরিপূর্ণ।

৪. দুর্নীতি: দুর্নীতি ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। রাসূল (সা.) সততা ও সচ্চরিত্রের উদাহরণ ছিলেন। বর্তমানে অনেক নেতা দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়ে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন।

রাসূল (সা.) এর শিক্ষার মূল কথাগুলো হলো:

- **সমতা :** ইসলামে সকল মানুষ সমান। "কোন আরবের উপর অনারবের, এবং কোন অনারবের উপর আরবের, কোন সাদা চামড়ার উপর কালো চামড়ার এবং কোন কালো চামড়ার উপর সাদা চামড়ার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।" (হাদিস)

- **সততা ও ন্যায়পরায়ণতা :** রাসূল (সা.) সততা ও ন্যায়পরায়ণতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তিনি কখনো অন্যায় বা অবিচার করেননি এবং অন্যায়কারীদের কঠোরভাবে বারণ করেছেন।

- **সেবা ও দয়া** :রাসূল (সা.) অসহায়দের সহায়তা করতেন, দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতেন এবং সকল মানুষের প্রতি দয়ালু ছিলেন।

সুতরাং, বর্তমান নেতাদের রাসূল (সা.) এর শিক্ষাগুলো অনুসরণ করা উচিত। তবেই তারা প্রকৃত ইসলামের আদর্শকে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হবেন এবং সমাজে শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।

উপসংহার :

বর্ণবাদ মানব ইতিহাসের এক দুঃখজনক অধ্যায়, যা বৈষম্য ও শোষণের সৃষ্টি করেছে। ইসলাম বর্ণবাদের বিপরীতে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বিচারের বার্তা প্রদান করে। ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক নীতি হলো মানুষকে তাদের জাতি, রং, ভাষা বা সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে বিচার না করা, বরং তাদের চরিত্র ও কাজের ভিত্তিতে বিচার করা।

পবিত্র কুরআনে এবং নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা একে অপরকে চিনতে পারে এবং নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা গড়ে তুলতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, শেষ হজ্জের ভাষণে নবী মুহাম্মাদ (সা.) স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, "কোনো আরবের ওপর কোনো অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কোনো শ্বেতাঙ্গের ওপর কোনো কৃষ্ণাঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং কোনো কৃষ্ণাঙ্গের ওপর কোনো শ্বেতাঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, শ্রেষ্ঠত্ব শুধু তাকওয়ার ভিত্তিতে।"

অতএব, ইসলাম বর্ণবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে এবং একটি সাম্যভিত্তিক সমাজ গঠনের আহ্বান জানায় যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি ন্যায়বিচার ও সম্মানের সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারে। এই আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি, ভ্রাতৃত্ব ও মানবতার উন্নয়ন সম্ভব।

রেফারেন্স :

১.https://sarabangla.net/post/sb-433852/

২.https://www.dailynayadiganta.com/religion/536211/%E0%A6%B9%E0%A6%AF%E0%A6%B0%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%80

৩.https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2016/02/26/329227

৪.https://response-to-anti-islam.com/show/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-/172

৫.https://www.jugantor.com/islam-life/308027/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%A6-%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%9C%E0%A7%80-%E0%A6%AF%E0%A7%87-

%E0%A6%95%E0%A6%A0%E0%A7%8B%E0%A6%B0-
%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-
%E0%A6%89%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3-
%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A8

৬.https://www.jugantor.com/islam-life/476076/%E0%A6%85%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-
%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-
%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%A8-
%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B0-
%E0%A6%86%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%A3